ভগবতী দেবী।

বিদ্যাসাগর জননী

ভগবতী দেবী।

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীকানাইলাল আঢ্য।

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Monica Press.

সন ১৩২০ সাল।

All Rights Reserved.

মূল্য ৸০ আনা।

মণিকা প্রেস
৫।১২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

NORMAL
HOOGHLY
SCHOOL

"The genius of humanity is the real subject whose biography is written in our annals."—Emerson.

*
* *

"Not only in the common speech of man, but in all art too—which is or should be concentrated and conserved essence of what men speak and show—Biography is almost the one thing needful."—Carlyle.

GOVT. NORMAL SCHOOL HOOGHLY

ভূমিকা।

মানবদেহ নশ্বর। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন গুণের আদর থাকিবে। কারণ, গুণই চিরস্থায়ী, —প্রতিভাই চির আদরণীয় ও পূজনীয়। প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তির পরিচায়ক ও তাঁহারাই মানুষের আদর্শ। প্রতিভা দৈবশক্তি বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের শক্তি বিসর্পিত।

জীবনী সমালোচনা লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন। করুণার প্রতিমূর্ত্তি, পুণ্যশীলা ভগবতী দেবীর ন্যায় ভাগ্যবতী নারীরত্নের জীবনী সমালোচনায় অনেক শিখিবার আছে। বিশ্বজনীন ভক্তি—প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী আলোচনায় পুণ্য আছে।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, অহল্যাবাই প্রভৃতি যে সকল রমণীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া পুণ্যের লীলাক্ষেত্র ভারতভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদিগের পুণ্যশীলা ভগবতী দেবীর তুলনা সম্ভবে কি? তাঁহারা রাজরাজেশ্বরী,ধনশালিনী,—আর ভগবতী দেবী পর্ণকুটীরবাসিনী। বহির্জগতে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও আমাদিগের মনে হয়, অন্তর্জগতের ব্যাপারে সকলেই একরূপ। নদীতে বন্যা আসিলে, যেমন নদীহৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া অগাধ জলরাশি নদীর দুই পার্শ্ব প্লাবিত করে,—উচ্চ নীচ দেখে না, পাহাড় পর্ব্বত মানে না,—অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার বলে আপনি ধাবিত হয়, সেইরূপ যে প্রেম ভগবতী দেবীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিকের বাধা, বিঘ্ন, প্রলোভন না মানিয়া

আপনার মহালক্ষ্যপথে ধাবিত হইয়াছিল, যে প্লাবনে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বদেশের ও বিদেশের শত শত নরনারীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সে প্রেমের তুলনা কোথায়!

এই পুণ্যশীলা নারীরত্নের জীবনচরিত লিখিতে হইলে, যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, তৎসমুদয় সম্যক্‌রূপে সংগ্রহ করিবার কোন উপায় নাই। কারণ কালবশে তাহার অধিকাংশই বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক আমরা বিশ্বস্তসূত্রে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার ত্রুটি করি নাই। এই পুস্তকসন্নিবিষ্ট অধিকাংশ ঘটনা আমরা ভগবতী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা মন্দাকিনী দেবীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি আবেগময়ী ভাষায় মাতৃচরিত্র বর্ণনা করিয়া তাঁহার জননীর দিব্যমূর্ত্তি আমাদিগের চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা টাউন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত বীরসিংহ-নিবাসী ৺রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়, পুড়শুড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতেও আমরা কয়েকটী ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছি।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ভগবতী দেবীর মধ্যমা কন্যা ৺দিগম্বরী দেবীর পৌত্র, ডাক্তার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে আমাদিগকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে চিরদিন তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়া রহিলেন।

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩১৯ সাল। — গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কতিপয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃপাদৃষ্টিতে এবং জন সাধারণের উৎসাহে অল্পদিনের মধ্যেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল। বঙ্গের যে বিরাট্ মহাপুরুষ ক্ষুদ্র বীরসিংহ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন, যিনি আর্য্য-ঋষি-প্রদর্শিত ত্যাগধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ, বঙ্গের অশেষবিধ কল্যাণ-সাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয়, দেশ-পূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমারাধ্যা পুণ্যশীলা জননী ভগবতী দেবীর চরিত্র-চিত্র স্বদেশবাসিগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া যে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইজন্য এই দীনহীন গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থের বহুল প্রচারকল্পে বিদ্বৎসমাজ উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিয়া গ্রন্থকারকে কৃতার্থ করিবেন।

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বাল্যজীবন ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও বধূজীবন ১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগরের জন্ম ৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিশুচর্য্যা ও সন্তানশিক্ষা ৪৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষা ৬৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক জীবন ৮৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহানুভবতা ও পরার্থপরতা ১১২

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লোকানুরাগ ও সেবাধর্ম্ম ১১৯

নবম পরিচ্ছেদ।

ধৈর্য্য ও সৎসাহস ১২৬

দশম পরিচ্ছেদ।

সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার ১৩১

বিষয়			পৃষ্ঠা
একাদশ পরিচ্ছেদ।			
দয়া ও পরোপকার	...	...	১৩৫
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।			
সরলতা ও পবিত্রতা	...	...	১৩৯
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।			
সময়ের সদ্ব্যবহার	...	...	১৪৪
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।			
মহত্ত্ব ও মিতাচার	...	...	১৪৮
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।			
সন্তানবাৎসল্য	...	...	১৫২
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।			
নৈতিক বাধ্যতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি		...	১৫৬
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।			
ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা	...	...	১৬০
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।			
জীবসেবা ও বিশ্বপ্রেম	...	...	১৬৬
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।			
চরিত্রমাহাত্ম্য	...	...	১৭২
বিংশ পরিচ্ছেদ।			
মৃত্যু ...	..	...	১৭৮
একবিংশ পরিচ্ছেদ।			
চিতাভস্ম ...	...	...	১৮৩

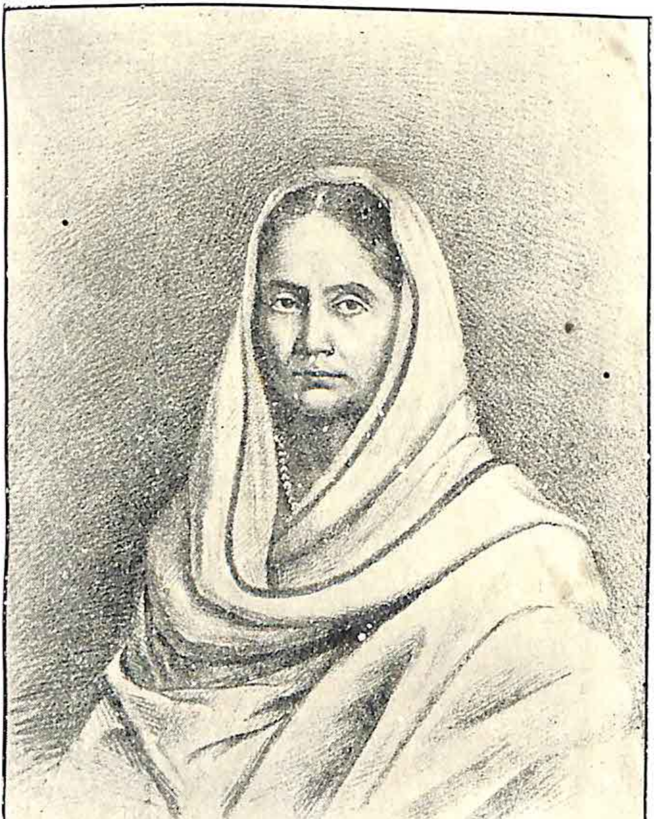

ভগবতী দেবী।

The Emerald Ptg. Works.

Forwarded ... the Director of Public Instruction

ভগবতী দেবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বাল্যজীবন।

এই পৃথিবীর কত স্থানে কত সূর্য্যকান্তমণি, সূর্য্যকিরণব্যতিরেকে হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করে! কত উদারচেতা নর-নারীর উন্নতচরিত্র আলোচনার অভাবে বিস্মৃতি-সলিলে বিলীন হইতেছে, কে বা তাহার সন্ধান রাখে! প্রতিভা ইহজগতে আদরণীয় ও পূজনীয়, এবং ইহা ঐশ্বরিক দান। করুণাময় জগদীশ্বর ধনিনির্ধন-নির্ব্বিকল্পে ও নরনারীনির্ব্বিশেষে এই স্বর্গীয় ধন সকলকে বিতরণ করেন। আমরা খনা লীলাবতী প্রভৃতিতে বুদ্ধিগৌরবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হই, রাণী ভবানী অহল্যাবাই প্রভৃতিতে সেবাধর্ম্ম ও শাসন-নৈপুণ্য দেখিয়া পুলকিত হই, তারাবাই দুর্গাবতী প্রভৃতিতে সামরিক কৌশল ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের যশোগানে প্রবৃত্ত হইয়া

থাকি, এবং এই সকল আর্য্যরমণী নারীজাতির আদর্শভূতা ও স্বর্গস্থ দেবী-সমাজের বরণীয়া বলিয়া গৌরবান্বিত হই, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণকুটীরে প্রতিভার যে উন্মেষ, সে বিষয়ের পর্য্যালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। সেইজন্য মনে হয়,দরিদ্রের পর্ণকুটীরে প্রতিভার যে বিকাশ, তাহা বনজাত সুরভিকুসুম, সুগন্ধি গিরিশৈবাল ও অরণ্যসুলভ পরিমলপূর্ণ কস্তূরীর স্বকীয় গুণগৌরবের ন্যায় স্বস্থানেই স্বতঃ প্রকাশিত থাকে, জগৎ তাহার অনুসন্ধান করে না! ঊনবিংশ শতাব্দী বিধাতার কি শুভ আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া অবনীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিল,তাহা বুধগণই বলিতে পারেন। কারণ, এই শতাব্দীতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে এবং ধর্ম্মের বিমল ও পবিত্র জ্যোতিতে বসুন্ধরা উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীরই প্রথমার্দ্ধে কর্ম্মবীর ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াসিংটন, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, উইল-বারফোর্স; ধর্ম্মবীর লিনকন ও থিওডোর পার্কার প্রভৃতির জননীগণ এবং সেবাব্রতধারিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা, গ্রেস ডার্লিং, মেরি কার্পেণ্টার ও কুমারী কব্‌ প্রভৃতি মহিলাগণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গ-ভূমির কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে এক নারীরত্ন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনিই আমাদের পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ভগবতী দেবী।

এই বিশ্বের কি বিচিত্র বিধান! যে বংশে কোন মহাপুরুষ বা নারীরত্ন জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্ব হইতেই সেই বংশ ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়া থাকে। ভগবতী দেবী সম্বন্ধেও আমরা এই অশেষকল্যাণকর নিয়মের অনুক্রম দেখিতে পাই। তাঁহার পিতামহ, একজন সত্যসন্ধ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাত্ত্বিক

6.10.94

প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা মহাত্মা রামকান্ত তর্কবাগীশ জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিম সুপ্রসিদ্ধ গোঘাট গ্রামে বাস করিতেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ইনি পাতুলগ্রামনিবাসী অদ্বিতীয় পণ্ডিত পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গামণিদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার গর্ভে রামকান্তের লক্ষ্মী ও ভগবতীনাম্নী পরমসুলক্ষণা দুই কন্যা জন্মে। রামকান্ত সংসারসুখসম্ভোগ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া সর্ব্বথা বিষয়বাসনা পরিহার করেন, এবং রামজীবনপুরের অতি সন্নিহিত করঞ্জী গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রতি অমাবস্যায় অন্ধকারময়ী ঘোরা রজনীতে নির্জ্জন ভীষণ শ্মশানে নির্ভয়ে একাকী উপবেশন করিয়া জপ করিতেন। ক্রমে শবসাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। শেষাবস্থায় তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে 'মঞ্জুর' এই শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিতেন।

জামাতা শবসাধন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় করঞ্জী গ্রাম হইতে জামাতা রামকান্ত, দুহিতা গঙ্গামণি ও দৌহিত্রী লক্ষ্মী ও ভগবতীকে পাতুল গ্রামে আনয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ একজন সহৃদয়, সদাশয়, ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের পোষণ, গুণিজনকে উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার,—এই সকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। যেখানে সৎসঙ্কল্প, সদনুষ্ঠান, সৎপ্রসঙ্গ, সেখানে তিনি

বিদ্যমান থাকিতেন। কায়মনোবাক্যে পরপীড়নপরিবর্জ্জন, সকলের প্রতি অভিন্নপ্রীতি ও প্রিয়চিকীর্ষা, যথাশক্তি দান,—এই শাশ্বতব্রতে বাল্যকাল হইতেই তিনি দীক্ষিত ছিলেন। স্বাভাবিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ প্রভৃতি গুণে তিনি বিভিন্নপ্রকৃতি লোকদিগকে লইয়া বহুতর লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতার অবিদ্যমানতায় অন্যান্য সহোদর ও সহোদরা এবং তাঁহাদের সন্তানগণের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়া পিতার সুনাম রক্ষার জন্য এক্ষণে তিনি যত্নবান্ হইলেন। তখন হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারস্থ সকলে কিরূপ সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল ছিল না। তখন লোকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিতে জানিতেন। স্বীয় পুত্র, কন্যা ও পরিবারবর্গকেই সুখী করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন না। আত্মীয় স্বজনের সেবা, জ্ঞাতিবর্গের যথাশক্তি সাহায্য, মৃত আত্মীয় স্বজনের অনাথ ও নিরাশ্রয় পুত্রকন্যাগণের ভরণপোষণ, ধর্ম্মালোচনা, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় ভবনে শাস্ত্রকথা, কথকতা ইত্যাদির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগৃহস্থোচিত কার্য্য ছিল। এবং ইহাতেই তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। অপর দিকে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা ছিল; গৃহস্বামীকে সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেন, সংসারের মধ্যে কেহ উপার্জ্জনে অপারগ হইলে, তিনি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সংসারের কল্যাণসাধনে যত্নবান্ হইতেন এবং গৃহস্বামীর অনুগত থাকিয়া সতত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। এইরূপে হিন্দুর এক একটী একান্নবর্ত্তী পরিবার সংসার-

মরুভূমির মধ্যে এক একটী মরূদ্যান ছিল, এক একটী শান্তিনিকেতন ছিল। সেই জন্য মনে হয়, বহু শতাব্দীব্যাপিনী পরাধীনতা ও কুশিক্ষায় বঙ্গসমাজকে তখন যদিও হীনবীর্য্য ও মৃতকল্প করিয়াছিল, কিন্তু প্রাণহীন বা হৃদয়বিহীন করিতে পারে নাই। কারণ, তখন দেশে ত্যাগ-স্বীকার ছিল, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুদ্ধিতে দেশ প্রবুদ্ধ ছিল। আলস্য ও জড়তার মস্তকে পদাঘাত করিয়া আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভর বলে দেশের কল্যাণের জন্য সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। জীবনধারণ করা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই মহামন্ত্র জ্বলন্ত অক্ষরে হৃদয়ে হৃদয়ে মুদ্রিত ছিল এবং স্বার্থত্যাগী হইয়া নিজের ও অপরের কল্যাণ-সাধনে সকলে যত্নবান্ হইতেন। ফলতঃ স্বার্থশূন্যতাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে লোক-হিতের জন্য নিরন্তর কর্ম্ম করিতে হইবে,—এইরূপ কর্ম্মে যদি প্রাণ যায়, তাহাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এইভাব তখন দেশের মধ্যে প্রবল ছিল এবং সকলে ইহাকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু হায় সেকাল আর একাল! এখন দেশে সে স্বার্থত্যাগ কোথায়? সে ধর্ম্মভাব কোথায়? হিন্দুর সেই একান্নবর্ত্তী পরিবার সহানুভূতি ও ধর্ম্মভাবের অভাবে শতধা বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ শক্তিহীন ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে!

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত আত্মচরিতে তাঁহার মাতুলালয়ের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যে হৃদয়স্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপাঠে সকলে অবগত হইতে পারিবেন, কিরূপে হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আত্মীয় স্বজন ও

সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন :— "সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের অধিক দিন পরস্পর সদ্ভাব থাকে না, যিনি সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে সেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য অল্পদিনেই ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে; অবশেষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। কিন্তু সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি সহোদর সমান ছিলেন, এজন্য কেহ কখনও ইহাঁদের চারিজনের মধ্যে মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী ভাগিনেয়ী ও তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের উপরও তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা পুত্র কন্যা সহ মাতুলালয়ে গিয়া যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন, কন্যারা পুত্র কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।"

"অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, বস্তুতঃ এই অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সঙ্খ্যা যাই হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদর, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগতপরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

"বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায় এই মুখোপাধ্যায়পরিবারের স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুতর গ্রামে আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপন্মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয় অথবা স্বীয় পরিবারের সুখ সাধনে প্রয়োগ, একদিন একক্ষণের জন্যেও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত নিয়োজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।"

"রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, মাতৃদেবী পুত্র কন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন, কিন্তু একদিনের জন্যও স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্র কন্যাদের উপর এরূপ স্নেহ প্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিচলিত স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।"

ভগবতী দেবী শৈশবকালে মাতুলালয়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কোন অধীত বিদ্যালাভ হয় নাই। কারণ দেশে

তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে ভক্তি করিবে না, গৃহকর্ম্মে উপেক্ষা করিবে, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ও ধীরতায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রগল্ভা ও অশান্তপ্রকৃতি হইবে, এইরূপ অনিষ্টপাতের সকলে আশঙ্কা করিতেন। দেশের স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধা হউন, তাঁহারা মাতৃস্থানীয়া,যাহাতে পূর্ব্বতন ঋষিপত্নীগণের দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রতিভা-শালিনী ও তত্ত্বদর্শিনী হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে মৈত্রেয়ী, গার্গী ও উভয় ভারতীর অনুসরণ করিতে পারেন, জ্ঞান-জগতে খনা ও লীলাবতীর সদৃশী হন, যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, পুরুষের ন্যায় তাঁহাদেরও অধ্যাত্মবিদ্যায় অধিকার আছে, তাঁহারাও বেদের অর্থবোধ ও মন্ত্র দর্শনে সমর্থা এবং তাঁহারা সেই সচ্চিদানন্দময়ীর শক্তির বিকাশমাত্র,—এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া নিজ নিজ চরিত্রবলে যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সন্ততিগণের চরিত্রগঠনে সহায় হন, এরূপ ভাবে কোন অধীত বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রণালী তখন লোকচিন্তার অতীত ছিল। সুতরাং ভগবতী দেবীর ভাগ্যে বাল্যকালে এরূপ ভাবের কোন শিক্ষালাভ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার মাতুলালয়ে আদর্শ হিন্দু পরিবারে প্রতিদিন যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতেন, তাঁহার সম্মুখে যে জ্বলন্ত আদর্শ বিদ্যমান ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার যে কোন শিক্ষালাভ হয় নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পূর্ণতা লাভই যথার্থ শিক্ষা; চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উপযুক্ত ব্যবহার ও বিষয়পরিচালনাই যথার্থ শিক্ষা। ইন্দ্রিয়গণ যথাযথ সংযত হইলে, উহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের

অনুভূতি হয়, মন ও বুদ্ধির স্ফুরণ হয় ও চিত্তের উদারতা সম্পাদিত হয়। মাতুলালয়ে আদর্শ হিন্দুপরিবারের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায়, কিরূপ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, লোকের কল্যাণচিন্তা করিতে হয়, কিরূপ করিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কেমন করিয়া দেখিতে হয়, বলিতে হয়, চলিতে হয়, বসিতে হয় প্রভৃতি অশেষ কল্যাণকর অত্যাবশ্যক শিক্ষালাভ ভগবতী দেবীর বাল্যকালেই পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। সুশীলতা, ভব্যতা, ঔদার্য্য, বিনয়, শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ যে সামাজিক বন্ধনের প্রধান উপায়, এ শিক্ষার বীজ তাঁহার বাল্যহৃদয়েই অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

আলস্য ও জড়তা তাঁহার দেহে কখনও স্থান পায় নাই। তিনি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। পুষ্পচয়ন, পুষ্পপাত্রসম্মার্জ্জন, ও বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্ম্মে তিনি অনুক্ষণ লিপ্ত থাকিতেন। এ সম্বন্ধে কেহ কখন তাঁহাকে শ্রমবিমুখ হইতে দেখে নাই। তিনি শ্রমেই শান্তিলাভ করিতেন, এবং শ্রমেই বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেন। আমরা এ স্থলে তাঁহার শৈশব-জীবনের দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

মহাপুরুষ বা নারীরত্নরূপে যাঁহারা জন্মপরিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের সহিত সাধারণ মনুষ্যের প্রভেদ এই দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিতে পারেন ও করেন। তাঁহাদের উক্তিই তাঁহাদের যথার্থ জীবনী। সাধারণ মানব বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অনেক সারবান্ উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু সেগুলি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারেন না। মহাপুরুষ জগতের কল্যাণসাধনে সতত সচেষ্ট।

তিনি মানবজাতির উন্নতির নূতন নূতন পথের আবিষ্কার করেন; সাধারণ মানবের ন্যায় তিনি সুখ দুঃখ বা হাস্যক্রন্দনের মধ্য দিয়া স্বীয় বহুমূল্য জীবন অতিবাহিত করেন না। জীবনের প্রথম অংশেই আত্মীয়স্বজনের দুঃখ ও অভাব দর্শনে তিনি বিমর্ষান্বিত হন ও জগতেরও এই প্রকার অবস্থা কি না জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাঁহার বিশাল হৃদয়, বিশালতর হইয়া ক্রমে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যায়,—কোন বিশেষ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এক কথায় তিনি জগৎকে আপনার হৃদয় দিয়া ভালবাসেন, আপনার বলিতে জগৎ ভিন্ন তাঁহার অপর কিছু থাকে না।

ভগবতী দেবীর মাতুলালয়ের গ্রামে ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়স্থ, নাপিত প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণেতর জাতির বাস ছিল। তাঁহার মাতুলালয়ের সন্নিকটে অনেক দরিদ্র তেওর ও বাগ্দী বাস করিত। ভগবতী বাল্যকালে এই সকল জাতীয় সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়ার মধ্যে তাঁহার এক বিশেষত্ব এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল সমবয়স্কা বালিকারা তাঁহাকে ক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি বলিতেন, "তোমরা সকলে আমাদের বাটীতে এস, আমরা এক সঙ্গে খেলা করিব।" এই সকল বালিকাদিগের প্রত্যেকের সহিত মকর, সই প্রভৃতি মৈত্রীবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাঁহার ভালবাসার কি এক অদ্ভুত প্রগাঢ়তা ছিল যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত তিনি তাহাকে আপনার করিয়া ফেলিতেন। এই সকল সমবয়স্কা বালিকারা তাঁহার এতদূর বাধ্য ও অনুগত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার অদর্শন তাহারা সহ্য

করিতে পারিত না। তিনি তাহাদিগকে লইয়া ধূলাখেলা করিতেন না। কারণ,বালিকারা সাধারণতঃ যেরূপ ধূলাখেলা করে,সেরূপ ক্রীড়ায় তাঁহার মন ছিল না। তিনি তাহাদিগের সহিত ব্রতকথা বলিতেন, মাতামহীর নিকট যে সকল উপদেশপূর্ণ গল্প বা পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতেন, সেই সমুদয় গল্পচ্ছলে বলিতেন। তাহাদের অভাব অভিযোগ মন দিয়া শুনিতেন এবং অভাবনিরাকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বেশবিন্যাস করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে তিওর, বাগ্দী প্রভৃতি জাতিবিচার তাঁহার ছিল না। ঐ সকল সমবয়স্কা বালিকারা খেলা করিবার জন্য একত্র হইলে, কখন কখন তিনি তাহাদিগকে সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি তাহাদিগের কোন অমঙ্গল সংবাদ বা দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া এরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, তাঁহার হৃদয় এরূপ বিগলিত হইত যে, তাঁহার রক্তোৎপলনিভ গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইত। সঙ্গিনীদিগের মধ্যে কেহ পীড়িতা হইলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। ইহাতে তিনি সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার এই সকল বাল্যলীলা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তিনি শৈশবকাল হইতেই সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবেই যেন তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সেবাধর্ম্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। মনুষ্য মাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ; ব্রহ্মের বিকাশই মানুষ। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নরসেবায় নিযুক্ত থাকেন, আমরা সেই

ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়? এই সেবাধর্ম্মে ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে। যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য—ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান; সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবেন।

বাল্যকাল হইতেই ভগবতী দেবী মিতাচারিণী ছিলেন। সামান্য পদার্থকেও তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন না। এবং সেই সকল দ্রব্যের তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন। বাল্য জীবনেই যেন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লইয়াই এই সংসার। যেন তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সম্পদ্, অনন্ত হইতে অনন্ত যাঁহার সঞ্চয়, একটী শুষ্ক পত্র, চ্যুত পুষ্প, বিন্দুমাত্র জল, অথবা কণাপরিমাণ মৃত্তিকা যখন তাঁহার নিকট তুচ্ছ নহে এবং তিনি এই সকল বস্তুর মিতব্যয়ের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব কোন্ সাহসে ও কি অহঙ্কারে সামান্য বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহার উচ্চ দানের অবমাননা করিব! এই মহান্ ভাব তাঁহার বালিকাহৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, তিনি সামান্য ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রটী পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে গেলে, বাঁধা দিয়া কাড়িয়া লইতেন এবং যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন,—বিশ্বাস ইহা দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল কার্য্য সাধিত হইবে।

উৎকৃষ্ট অশন, বসন ও ভূষণে তাঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই তিনি পরিতুষ্ট হইতেন। তিনি যেন বাল্যজীবনেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, লালসারূপ বহ্নিশিখা কোন ক্রমেই প্রশমিত হয় না, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না,—উত্তরোত্তর উপচীয়মান হওয়াই ইহার ধর্ম্ম। সেই জন্য তিনি আত্মসুখ বিনিময়ে পরের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান করিয়া সন্তোষরূপ পরমধন লাভ করিতে সতত যত্নবতী হইতেন।

বাল্যজীবনে তাঁহার আর এক বিশেষত্ব —তাঁহার দীন ভাব। অহ-ঙ্কার যেন ক্ষণেকের তরে তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রত্যুতঃ দীনতা মানব-চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কার। সংসার জীবনেও ইহার অদ্ভুত প্রভাব দৃষ্ট হয়। অহঙ্কারীকে সকলেই দ্বেষ করে; দীনতা সর্ব্বত্র জয়লাভ করে। আচণ্ডাল সকলে তাঁহার দীন চরিত্রে মোহিত হয়। ধর্ম্মজগতের ত কথাই নাই। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মূলে দীনতা ও তৎসহচর সৎসাহস ও ঈশ্বরনির্ভরতাই রাজত্ব করিতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূত-নিয়ামক হইয়াও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ মহম্মদ একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও আপনাকে কূপজলোত্তলনরূপ দাস্যকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া পরি-বার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও দীনহীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া জগতের পূজ্য হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের দীনতা ও অভিমানশূন্যতা আজিও আবঙ্গ-উৎকলে বিঘোষিত হইতেছে।

দীনতা ভক্তিসাধনার প্রধান অঙ্গ; অথবা দীনতা ভক্তিসাধনার পরিপক্ক ফল। দীন ভক্ত যে ঈশ্বরানুগৃহীত, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এই যে, জীবমাত্রই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করে। দীন ভক্তের পদচালনে পৃথিবী পবিত্রা হয়, সাধারণ স্থল মহাতীর্থে পরিণত হয়, তাঁহার সঙ্গিগণ নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বায়ু মণ্ডলের কুভাব তরঙ্গ প্রশমিত করিয়া তিনি শান্তির মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত করেন। তাঁহার চিত্তাকর্ষক চরিত্রে জীবমাত্রই বশীভূত হইয়া পড়ে। তাঁহার সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে, তাঁহার চরিত্রের মধুরতায়, তাঁহার মিষ্টবাক্যে ও বিনয়নম্র দৃষ্টিতে কুপথ-গামী জনগণ নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভগবতী দেবীর বাল্যজীবনে তেজস্বিতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দীনতার সহিত তেজস্বিতার সম্মিলন মণিকাঞ্চনসংযোগবৎ তাঁহার বালিকা-হৃদয়ে পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার মাতুলালয়ের সন্নিকটে যে সকল দরিদ্র তেওর ও বাগ্দীরা বাস করিত, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে তিনি তণ্ডুলাদি আহার্য্য দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি বিতরণ করিতেন। পাছে, ইহা দেখিয়া পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে তাঁহার মাতা এক সময়ে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ভগবতী দেবী বলিলেন, "মামা কখন ইহাতে রাগ করিবেন না। যদি রাগ করেন, তাঁহাকে একটী চরকা নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বলিব। সেই চরকায় সূতা কাটিব এবং সূতা বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পাইব, তদ্দারা তণ্ডুল ও বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া উহাদিগকে বিতরণ করিব"। ক্রমে এই কথা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়। তিনি এই কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহার এই বালিকা ভাগিনেয়ীর

কার্য্যকলাপে কি যেন এক স্বর্গীয় ভাব দেখিতে পাইতেন। তিনি এই কথা শুনিয়া ভগবতী দেবীকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"মা, আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! মা তোমার যত ইচ্ছা তুমি গরিবকে দান করিও। যদি তোমাকে কেহ কিছু বলে, তুমি বলিও এ দান তোমাদের জন্য তোলা রহিল। গরিবকে এক গুণ দিলে ভগবান্ দশ গুণ দিবেন। গরিবকে দান করিলে কি কখন অপব্যয় করা হয়?" শাস্ত্রে আছে,—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

দান করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া দেশকালপাত্র বিবেচনায়, অপকারীকেও যে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে। দানের জন্য অহঙ্কার প্রকাশে ভগবতী দেবীর আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি সুনামের জন্য কখন দান করিতেন না। দরিদ্রের সেবা এবং রুগ্নের শুশ্রূষা আজীবন তাঁহার নিষ্কামপ্রসূতা নিত্যক্রিয়া ছিল।

আহা! এরূপ শিক্ষা দীক্ষার কথা মনে করিলে আনন্দাশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। সে কালের এক একটী একান্নবর্ত্তী পরিবার কি শান্তিনিকেতনই ছিল, কি পুণ্যের প্রস্রবণই সেখান হইতে প্রবাহিত হইত! ভগবতী দেবী, তুমিই ধন্য, যে এরূপ পুণ্যাশ্রম মাতুলালয়ে তুমি বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়াছিলে! এরূপ মাতুলালয়ে তোমার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল! এই আদর্শ হিন্দু গৃহের ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, ভাবভক্তি তোমার চরিত্রগঠনের প্রধানতম উপাদান হইয়াছিল! এবং উত্তরকালে তোমার গর্ভে বঙ্গের যে বিরাট্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন, তাঁহার যে অলৌকিক লোকসেবার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে উর্ব্বর করিয়াছে, নবজীবন প্রদান করিয়াছে ও শক্তিশালী করিয়াছে, সেই অপ্রতিহত প্রবাহের উৎপত্তিস্থল, তোমার যে পবিত্র হৃদয়ে নিবদ্ধ দেখিতে পাই, সেই পবিত্র হৃদয় তোমার এই পুণ্যাশ্রম মাতুলালয়েই সংগঠিত হইয়াছিল!

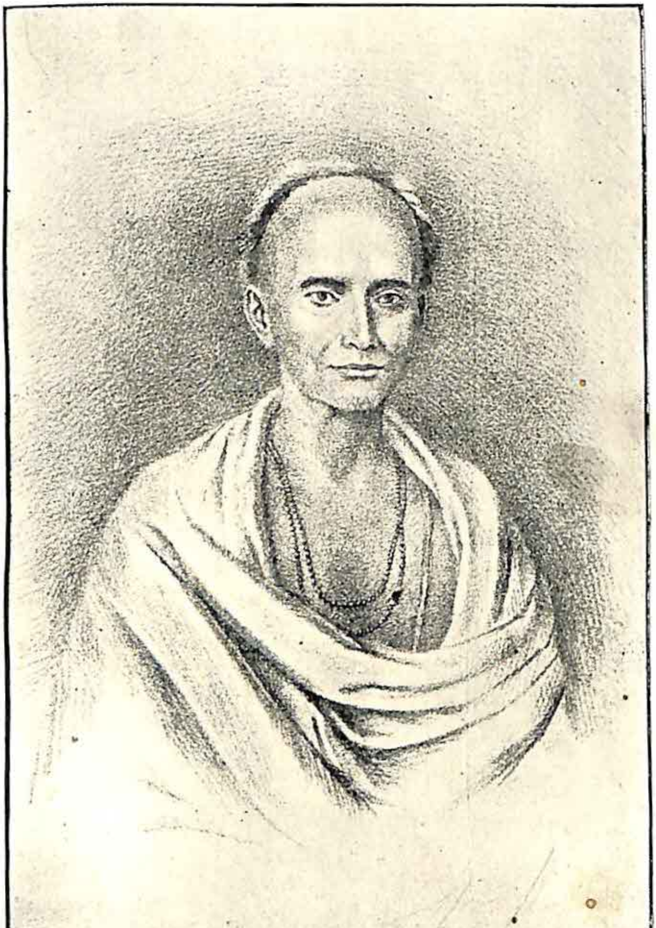

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

The Emerald Ptg. Works.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও বধূজীবন।

১৭৩৫ শকে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বনমালিপুর গ্রামের ৺ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র এবং রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভগবতী দেবীর শুভপরিণয় কার্য্য সমাধা হইল। তখন ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ কি চব্বিশ বৎসর; ভগবতী দেবী নবম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে ভগবতী দেবীর শ্বশুরকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গতিসম্পন্ন ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র; সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তৃতীয় পুত্রের নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই ভগবতী দেবীর শ্বশুর। রামজয়, ঘাটাল মহকুমার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের দুর্গানাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালক্রমে রামজয়ের দুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠের নাম কালিদাস। কন্যা চারিটীর নাম—মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দময়ী ও অন্নপূর্ণা। ভুবনেশ্বর বার্দ্ধক্যনিবন্ধন

মানবলীলাসম্বরণ করিলে পর, তাঁহার পুত্রগণের বিষয়বিভাগ উপলক্ষে পরস্পর বিষম মনান্তর ঘটে। রামজয় ধার্ম্মিক ও উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য, প্রাণসম সোদরবর্গের সহিত বিরোধ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, দুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যা রাখিয়া, কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ-পর্য্যটনে প্রস্থান করেন। রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; তদীয় পত্নী দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এতদূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবী পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয়কে লইয়া, পিতৃভবন বীরসিংহে আগমন করিলেন। তাঁহার পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত, সমাদরপূর্ব্বক নিরাশ্রয়া দুহিতা ও তাঁহার সন্তানগণকে স্বীয় সদনে আশ্রয় দিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম দশ বৎসর ও কনিষ্ঠ কালিদাসের প্রায় সাত বৎসর। তর্কসিদ্ধান্ত উভয় দৌহিত্রের লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত বীরসিংহনিবাসী গ্রহাচার্য্য পণ্ডিত কেনারাম বাচস্পতিকে নিযুক্ত করিলেন। আচার্য্য মহাশয় তৎকালে ঐ প্রদেশের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বল্প দিবসের মধ্যেই ভ্রাতৃদ্বয়কে বাঙ্গলা ভাষা, শুভঙ্করী অঙ্ক ও জমিদারী সেরেস্তার কাগজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া পরে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য সংসারের কর্ত্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত ছিল। উক্ত রামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের পত্নীর সহিত দুর্গাদেবীর

মনোমালিন্য ঘটিল। দুর্গাদেবী পরিশেষে বৃদ্ধপিতা তর্কসিদ্ধান্তকে সবিশেষ অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি সকলই বিশেষরূপ অবগত আছি। অতঃপর উহাদের সহিত তোমার একত্র সদ্ভাবে বাস করা চলিবে না। পৃথক্ স্থানে বাস করা নিতান্ত আবশ্যক। দুর্গাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন তর্কসিদ্ধান্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, রামসুন্দরের ও বধূমাতার সহিত দুর্গার এক গৃহে বাস করা দুরুহ, অতএব আমি স্বতন্ত্র স্থানে ইহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিব স্থির করিয়াছি। তাহাতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণও সম্মত হইলেন। অনন্তর বার্ষিক ৯।৶০ টাকা জমায় কিঞ্চিৎ ভূমি লইয়া, তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন; পরে জমিদারকে বলিয়া ও অনুরোধ করিয়া উক্ত জমি লাখরাজ করিয়া দিবেন স্থির করেন। ইতিমধ্যে তর্কসিদ্ধান্ত ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সুতরাং এই নূতন বাস্তু আর লাখরাজ হইল না। এই বাস্তুর বার্ষিক কর জমিদারকে দিতে হইল। দুর্গা দেবীর সংসার নির্ব্বাহের উপায়ান্তর ছিল না। তৎকালে বিলাতী সূতার আমদানি হয় নাই; এ প্রদেশের নিরুপায় অনেক স্ত্রীলোকেই টেকুয়া ও চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আত্মীয়বর্গের উপদেশানুসারে দুর্গাদেবীও অগত্যা একটী চরকা ক্রয় করিয়া সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলেন। সূতা বিক্রয় করিয়া অল্পই আয় হইত। তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা আপনার, দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণ পোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাঁহাদের আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে ক্লেশের সীমা ছিল না। এক্ষণে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর অতীতপ্রায়;

পড়া শুনা অধিক দিন করিলে সংসার চলা দুষ্কর। আত্মীয়বর্গ এই উপদেশ দেন যে, সংস্কৃত অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া, যাহাতে শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন, এরূপ বিদ্যাশিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। ঠাকুরদাস জননীর অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে নিরতিশয় কাতর হইয়া অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় জননীর অনুমতি লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

ঠাকুরদাস কলিকাতায় আগমনের পর কিরূপ কষ্টে দিনযাপন করিয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত আত্মচরিতে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ও তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায় কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাস এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কিজন্য আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, তিনি অকাতরে অন্ন ব্যয় করিতেন, এমন স্থলে, দুর্দ্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি, সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ঠাকুরদাসকে আশ্রয়প্রদান করিলেন।"

"ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার

7185 SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়নবিষয়ে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃত পাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি সংস্কৃত পড়িবার জন্য, সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন যথার্থ বটে, এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু, জননীকে ও ভাই ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন, সেইরূপ পড়া শুনা করাই কর্ত্তব্য।"

"এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে. পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে ইংরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইংরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, এই ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইংরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয় কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময় তাঁহার

6.10.94
8748 7185

নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকটে গিয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।”

“ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরি লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস ইংরেজী পড়ার অনুরোধে সে সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। * * * এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া তিনি দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন।” পরিশেষে তাঁহার শিক্ষকের পরামর্শানুসারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। কোনও কোনও দিন কার্য্যবশতঃ তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতে পারিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত।

“কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায় মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটী টাকা, যথা নিয়মে. জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও যারপরনাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। দুই তিন বৎসর পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কষ্ট দূর হইল।”

এদিকে রামজয় তীর্থস্থানে থাকিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তুমি পরিবার-বর্গকে কষ্ট দিয়া তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে তোমার অধর্ম্ম হইতেছে। একারণ পাঁচ বৎসরের পরে দেশে আগমন পূর্ব্বক বনমালিপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, সহোদরেরা পৃথক হইয়াছেন এবং শুনিলেন যে, তাঁহার পত্নী বীরসিংহের পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং রামজয় পরিবারবর্গকে আনয়ন করিবার জন্য বীরসিংহে গমন করিলেন। গৈরিকবসন পরিধান করিয়া, হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর বেশে শ্বশুর বাটীতে সমুপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ কাহাকেও আত্মপরিচয় না দিয়া, গ্রামের মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী, পিতাকে চিনিতে পারিয়া, 'বাবা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন রামজয় আত্মপরিচয় দিলেন। কয়েক দিবস বীরসিংহে অবস্থিতি করিয়া, পরিবারবর্গকে বনমালিপুরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী বনমালিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন না। যেহেতু তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন; এতাবৎ-কালের মধ্যে তাঁহাদের কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং রামজয় অগত্যা বীরসিংহে পরিবারবর্গকে রাখিতে বাধ্য হইলেন।

রামজয় অতি বুদ্ধিমান্, বলশালী, সাহসী, তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। নীরবে কাহারও নিকটে কোন অবমাননা সহ্য করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। চিরজীবন তিনি নিজ অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। কাহারও নিকট কোন উপকার প্রত্যাশায় হীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুই তিনি শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অতিশয় অমায়িক ও সদাশয় লোক ছিলেন।

সকলকে তিনি সমভাবে দেখিতেন এবং সকলের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন ; এবিষয়ে তাঁহার উচ্চ নীচ প্রভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী ও নিষ্ঠাবান্ ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি যোগীর ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিত।

তিনি লৌহযষ্টি হস্তে লইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না। এক সময়ে বীরসিংহ হইতে মেদিনীপুর যাইতেছেন, পথিমধ্যে এক ভল্লুক দেখিতে পাইলেন। ভল্লুক দেখিয়া ভয় না পাইয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলে, ভল্লুক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘূর্ণ্যমাণ হওয়ায় তিনিও অগ্রে অগ্রে ঘুরিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভল্লুক দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বৃক্ষটী বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল ; ঐ সময় রামজয় বৃক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে ভল্লুকের দুই হস্ত ধরিয়া বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ভল্লুক মৃতপ্রায় হইলে, ছাড়িয়া দিলেন। ভল্লুক মৃতকল্প ভূপতিত দেখিয়া, তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যোগী হইলেন। এমন সময়, ভল্লুক উঠিয়া দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গিয়া রামজয়ের পৃষ্ঠে নখাঘাত করিল, তখন পৃষ্ঠে শোণিত ধারা বিগলিত দেখিয়া ক্রোধভরে লৌহদণ্ড প্রহারে তিনি ভল্লুকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। ভল্লুকের পাঁচটী নখাঘাতের ক্ষতে প্রায় মাসাধিক কষ্ট পাইয়া পরে আরোগ্য লাভ করেন।

বীরসিংহের বাস্তবাটীর ভূস্বামী, রামজয়কে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন ; কিন্তু রামজয় দান গ্রহণ করিতে সম্মত

হন নাই। গ্রামের অনেকেই লাখরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তদবধি বাস্তুভূমির ৯।৵০ টাকা কর আদায় হইয়া আসিতেছে, রামজয়ের মনোগত ভাব এই যে, নিষ্করে বাস করিলে, ভূস্বামী পুণ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তিনি আজন্মকাল মনে মনে অহঙ্কার করিতে পারিবেন যে, আমি উহাকে চিরকালের জন্য বাসস্থান দান করিয়াছি; একারণ নিষ্করে বাস করিতে সম্মত হইলেন না।

"বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড় বাজারের দয়মাহাটার উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোনও অংশে অসুবিধা ঘটিবে না।

"এই প্রস্তাব শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল।

যথাসময়ে আবশ্যক মত, দুইবেলা আহার পাইয়া তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনার দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল এরূপ নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে একস্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।" এই সময়ে তর্কভূষণ মহাশয় ঠাকুরদাসের বিবাহ দিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে, একদিন রামজয়, ঠাকুরদাসকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে কর্ম্মক্ষম হইয়াছ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, আমি ঈশ্বরের আরাধনাভিলাষী; পুনর্ব্বার তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া ঠাকুরদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তিনি এ সংবাদ বাটীতে লিখিলেন।

ভগবতী দেবী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। মাতুলালয়ের স্বচ্ছল সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতায় আর তাঁহার মন পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তিনি স্বীয় পতির আত্মসম্মানকে এতদূর মূল্যবান্ মনে করিলেন, যে সন্তুষ্টচিত্তে মাতুলগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে নিতান্ত সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করিয়াও সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন সেই সময়ে, তিনি অনন্যমনে পতির চিত্তানুবর্ত্তন করিতেন, প্রত্যহ স্বহস্তে গৃহমার্জ্জনা, মৃত্তিকা দ্বারা উপলেপন, গৃহোপকরণ ভোজন পাত্রাদির সংস্কার, রন্ধন, যথাসময়ে ভোজ্য সামগ্রীর দান ও সাবধানে সমস্ত দ্রব্য রক্ষা করিতেন। তিরস্কার বাক্য মুখে আনিতেন না। গুরুজনের নিকটে উচ্চ আসনে উপবেশন বা উচ্চকথা কহিতেন না। সকলের প্রতি অনুকূলতা দেখাই-

তেন, আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করিতেন, কখনও অতিহাস্য বা অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিতেন না এবং কখনও ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। শ্বশুর ও শ্বশ্রূজনের প্রতি ভক্তি দেখাইতেন, দেবর, ননন্দার প্রতি মায়া মমতা প্রদর্শন এবং পরিবারস্থ লোকদিগকে বিনয়নম্র ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিতেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই এই সমুদায় সুগৃহিণীর ধর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি সেই দুঃখ-দারিদ্র্যময় সংসারে দগ্ধ হৃদয়ের শান্তিদাত্রী, নিরাশয়ের আশাদায়িনী, বিপদে বন্ধু, কৌতুকে সখী, রন্ধনে পাচিকা, ভোজনে জননী, সেবায় পরিচারিকাস্বরূপা ছিলেন। পতিসেবায়, দয়া দাক্ষিণ্যে ও গুরুভক্তিতে তিনি এক আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন।

শুনিয়াছি, মহারাজ দুষ্মন্তের পত্নী শকুন্তলা পতিগৃহে গমন কালে মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী।
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

তুমি এস্থান হইতে পতিগৃহে গমন করিয়া শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনকে সেবা করিবে, সপত্নীজনের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, স্বামী অবমাননা করিলেও ক্রোধবশতঃ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিও না। পরিজনের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল হইবে। অভ্যুদয়ে অহঙ্কৃত হইও না। যুবতীগণ এইরূপে গৃহিণী পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; প্রতিকূলচারিণীগণ গৃহের যন্ত্রণাস্বরূপ। জানি না, ভগবতী দেবীরও পতিগৃহে আগমন

সময়ে, তাঁহার মাতুল মহাত্মা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহাকে এরূপ কোন সারবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন কি না।

ভগবতী দেবীর বাল্যকালের সেবাধর্ম্ম, দীনতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সদগুণ সমূহ যৌবনকালীন অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের স্ফুর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সাংসারিক কোন বিষয়ের অস্বচ্ছলতা হইলে, তিনি প্রাণান্তেও প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হইতেন না। তিনি যেন মনে করিতেন, হিতৈষিতা বা কল্যাণ, প্রকৃতির উদ্দেশ্য সত্য; কিন্তু যতবার উপকৃত হইব, ততবার উপকারীর নিকট আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে এবং এই আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা চিরজীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যিনি ভূয়িষ্ঠপরিমাণে অন্যের হিতসাধন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ গরীয়ান্। যে কখন অন্যের উপকার করে না, কেবল অপরের হিতাস্পদ হয়, তাহার ন্যায় নিকৃষ্টস্বভাব জঘন্যকর্ম্মা লোক আর জগতে নাই; অন্যের নিকট উপকার গ্রহণ করা, অথচ অন্যের উপকার না করাই বিশ্বমধ্যে অতিহীন কর্ম্ম। উপকারীর প্রত্যুপকার করা প্রায় জগৎ মধ্যে ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু উপকৃত হইলে, তৃতীয় জনের হিতসাধনার দ্বারা তাহা পূর্ণমাত্রায়, বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতেই হইবে। জীবনের ঋণ মুক্তহস্তে পরিশোধ করিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কিন্তু প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কোন দ্রব্য দিলে, ভগবতী দেবী তাহা কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না, দেবপ্রসাদ ভাবিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেন। ফলতঃ তিনি প্রতিবেশীদিগের সহিত অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে সতত যত্ন করিতেন। তাঁহার শ্বশ্রূ-দেবীর সহিত কাহারও কখন মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইলে, তিনি

তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে বলিতেন, "মা, প্রভাতে উঠিয়া যাহাদিগের মুখ দেখিতে হইবে বা যাহাদিগকে মুখ দেখাইতে হইবে, তাহাদিগের সামান্য ত্রুটি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে যদি সতত আপনি যত্নবতী না হন, তাহা হইলে লোকে আপনার দেবীচরিত্রে নিশ্চয়ই দোষারোপ করিবে। আর মা, আপনি দিবারাত্রি আমাদের কত দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছেন, প্রতিবেশীদিগের একটী দৌরাত্ম্য কি আপনি সহ্য করিতে পারিবেন না ?" দুর্গাদেবী বধূমাতার মুখনিঃসৃত এই সকল অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন প্রতিবাদ করিতেন না। ঈষৎ হাস্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভগবতী দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

পল্লীর সমবয়স্কা রমণীগণ তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও স্নেহে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রত্যেকে মনে করিতেন, তিনি প্রত্যেককেই অধিক ভালবাসেন। তিনি তাহাদের সুখদুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, তিনি অনন্যমনে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। মধ্যে মধ্যে পথ্যাদি গৃহ হইতে রন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার স্নেহ ও মমতার এমনই এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, গৃহপালিত জীবজন্তু পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিলে, আনন্দে অধীর হইয়া পড়িত, তিনি তাহাদের যথাবিধি সেবা করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। ফলতঃ কি মহাপুরুষ, কি মহতী নারী সকলেই আপনাকে তৃণ হইতেও লঘু মনে করেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই মহাবাক্য তাঁহাদের হৃদয়ের মূল মন্ত্র। আত্মাভিমান তাঁহাদের কিছুই থাকে না। তাঁহারা মনে করেন, এ বিশ্ব তাঁহাদের এবং

তাঁহারা এ বিশ্বের; সুতরাং সমস্ত প্রাণিজগৎ তাঁহাদের প্রেমের বিষয়ীভূত। সেই জন্য, ইহ সংসারে তাঁহাদের দ্বেষ্য কেহই থাকে না, সকলেই প্রিয় হয়।

ভগবতী দেবী মনস্বিতা ও সাধুতা বিষয়ে একজন অগ্রগণ্য স্ত্রীলোক ছিলেন। রূপলাবণ্য এবং বিবিধ সদ্‌গুণে গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, ফলতঃ তাঁহার চূর্ণকুন্তলের মুক্তকেশপাশ দেখিলে, স্নেহপাশ বলিয়াই মনে হইত। আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রদ্বয় কারুণ্যপূর্ণ ছিল, মুখমণ্ডলে যেন তাঁহার বিশ্বব্যাপী হৃদয়ের বিশ্বপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় দেখিলে, সত্য ও অমৃতের উৎস বলিয়াই মনে হইত, তাঁহার বাহুদ্বয় যেন সদা সেবাব্রতনিরত বলিয়া মনে হইত, তাঁহার সরলতাময় সৌন্দর্য্যে তরলতার চিহ্নমাত্রও ছিল না, মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহার চরণারবিন্দে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার পদধূলিই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইত।

শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মনু বলেন :—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণোজ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া অপরাপর আশ্রমবাসিগণ জীবন ধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—তিন আশ্রমীই প্রতিদিন গৃহস্থ-

কর্ত্তৃক বেদার্থব্যাখ্যান ও অন্নদানাদি দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন, এ কারণ গৃহস্থাশ্রম—সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রমণীগণ এই সর্ব্বাশ্রমশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরম কারুণিক পরমেশ্বর লজ্জা, বিনয়, নম্রতা ও সুশীলতা ইত্যাদি সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়া ললনাগণকে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের লক্ষ্মীস্বরূপা এবং দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ ও রোগশোকতাপময় সংসারে, সতত শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারেরা এ নিমিত্ত সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, "শ্রীতে ও স্ত্রীতে কোনও প্রভেদ নাই।" ফলতঃ রমণীগণ মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় ইহ সংসারে স্বর্গীয় সুখ বিতরণ করেন। সংসার ক্ষেত্রে ভারতরমণী পতিসেবায়, পতিভক্তিতে, সন্তান প্রতিপালনে, দয়াদাক্ষিণ্যে, গুরুভক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দুরমণী শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে, দুঃখে শিরায় শিরায় ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। আতিথ্য, দেবসেবা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রকথিত কর্ম্মকাণ্ডগুলির ন্যায়, রমণীরত্নের কীর্ত্তিকলাপও হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্মচর্য্যার জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন। হিন্দু রমণীগণ স্বামীর সহিত সর্ব্বথা ধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত থাকেন। ধর্ম্মপরিণীতা বনিতা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত না হইলে গৃহস্থের যজ্ঞসমাপ্তি হয় না। এইজন্য তাঁহারা সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। সংসাররূপ মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে হইলে, রমণীগণের ন্যায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই প্রয়োজন। রঘুকুলতিলক গুণাভিরাম রামচন্দ্র সীতারূপিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পাতিব্রত্য গুণে, অরণ্যবাসেও স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। মহাবীর পাণ্ডু-

নন্দনগণ কৃষ্ণারূপিণী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবায় মুগ্ধ হইয়া ভীষণ বনবাসরূপ অসহ্য ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন। দরিদ্র ঠাকুরদাসও তাঁহার পর্ণকুটীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুণ্যশীলা ভগবতী দেবীর—সদনুষ্ঠান ও সদাচারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই. প্রবাসবাস ও দুঃখদারিদ্রজনিত অশেষ ক্লেশ,ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার মনে অশান্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই। এবং সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ ভিখারী দেবাদিদেব মহাদেব অন্নপূর্ণা দেবীর সাহায্যে যেরূপ তাঁহার চিরদারিদ্র্যপূর্ণ সংসারেও সুখ শান্তি স্থাপন করিয়া ধনাধিপতি কুবেরেরও পূজ্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র ঠাকুরদাসও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পুণ্যবতী ভগবতী দেবীর লোকসেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মায়া মমতার সাহায্যে, তাঁহার ধনী নির্ধন সমস্ত আত্মীয় স্বজনের ভক্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবতী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং মিতব্যয় ও মিতাচারে অভ্যস্তা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্বশ্রূদেবী গৃহের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপরেই অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি এই দরিদ্র সংসারেও অতি যত্ন সহকারে ও পবিত্রভাবে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সুসম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ ভগবতী দেবীর গুণেই ঠাকুরদাসের পর্ণকুটীর শান্তিপূর্ণ পুণ্যাশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য ভগবতী দেবী দিবারাত্রি সমভাবে পরিশ্রম করিতেও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। নিশীথে যখন গৃহের প্রায় সকলেই নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন, তখনও তিনি জাগরিত থাকিয়া পরিবারস্থ সকলের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত চরকায় সূতা কাটিতেন।

ভগবান্ মনু তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

স্ত্রীগণ যেথানে সমাদৃত, সম্মানিত ও পূজাপ্রাপ্ত হন, সেথানে দেবতারাও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী দেবীর বিবিধ সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া পরিবারস্থ সকলে সতত তাঁহার প্রতি পরম সমাদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন। বোধ হয়, সেইজন্যই দেবাশীর্ব্বাদে, দিন দিন ঠাকুরদাসের দরিদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পুরাকালে আর্য্যেরাও স্ত্রীজাতির সম্যক আদর ও গৌরব করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনার কিঙ্করীকে 'ভদ্রে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরস্পরের প্রতি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময় অগ্রে স্ত্রীলোকের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইত। ভরত বনবাসী রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাক ত?" ধৃতরাষ্ট্রও এইরূপ এক সময়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাজ্যের দুঃখিনী অঙ্গনারা ত উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়াছে? রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় ত?" যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের দ্রব্য অপহরণ, কি বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারীর বিশুদ্ধ চরিত্রে দোষারোপ করিত, সে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। আবহমান কাল হইতেই ভারতে নারীপূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এবং এই নারীপূজাই ভারতের এক অক্ষয়কীর্ত্তি।

ভগবতী দেবীর বধূজীবনের সেবাধর্ম্মের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

একদিন দিবা অবসান প্রায়, এমন সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহে অভ্যাগত হইলেন। সেদিন গৃহে অত্যন্ত অস্বচ্ছল অবস্থা। রাত্রে সন্তানগণ অর্দ্ধাশনে এবং পরদিন অনশনে দিবাযাপন করিবে, এইরূপই ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহে আগত উপায় কি? কিছুক্ষণ পরে ভগবতীর শ্বশ্রূদেবী দরবিগলিতনেত্রে করযোড়ে অতিথিকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আমি অতি হতভাগিনী। আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারিলাম না। অভ্যাগতের পরিচর্য্যায় বিমুখ হইলাম। আমার অরণ্যবাসই শ্রেয়ঃ। আমার সন্ততিগণ অনশনে নিশাযাপন করিবে, এইরূপ অবস্থা, আমি কিরূপ করিয়া অতিথি সৎকার করিব ভাবিয়া আকুল হইতেছি। দয়া করিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" ভগবতী দেবী অন্তরাল হইতে এই কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শ্বশ্রূদেবী সমীপে ধীরে ধীরে গমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"মা, এরূপ ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণাতুর অতিথিকে কখন প্রত্যাখ্যান করা হইবে না। যে কোন উপায়ে ইহার সৎকার করিতেই হইবে। আপনি ইহাকে বসিতে আসন ও পাদ্যার্ঘ দিউন।" এই কথা বলিয়া তিনি হস্তে পরিহিত একগাছি পিত্তলের পৈঁছা উন্মোচন করিয়া একজন প্রতিবেশিনীর নিকট বন্ধক রাখিলেন এবং তদ্বিনিময়ে একসের তণ্ডুল গ্রহণ করিলেন। পরে সেই তণ্ডুলের একপুয়া নিকটস্থ কোন মুদীর দোকানে প্রেরণ করিয়া একপুয়া দাউল আনাইলেন। পরিশেষে, সেই দাউল ভাতে ভাত রাঁধিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভগবতী দেবীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরিচর্য্যায় এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে

সেই 'ডালভাতে ভাত' পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণের ভোজনান্তে, ভগবতী শ্বশ্রূদেবীকে বলিলেন,—"মা, আমাদের ত একখানি কুটীর মাত্র সম্বল। এখন কোন প্রতিবেশীর গৃহে ইঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসুন।" শ্বশ্রূদেবীও বধূর কথামত কার্য্য করিলেন। পরদিবস প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ দুর্গাদেবীর গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপবীত দ্বারা হস্তদ্বয় সংবদ্ধ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলের দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—"হে সবিতৃদেব! তুমি জগল্লোচন। জগতের ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য সমস্তই তুমি নিরীক্ষণ করিতেছ। এই বালিকা বধূর হৃদয়ে সেবাধর্ম্ম, দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় স্বতঃ প্রবাহিত হইতেছে, এ সমুদয় বিষয় তুমি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছ, ইনি যেন ধনে বংশে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

আহা! সামান্য দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে আতিথেয়তা, উদারতা, যে সহানুভূতি ও প্রেম প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার তুলনা অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদেও নাই! এখনও এই হতভাগ্য দেশের অতি সামান্য নিভৃত কুটীরে নীরবে প্রত্যহ যে মহান্ পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার তুলনা কোথায়? ঐশ্বর্য্যের আগার ইন্দ্রভবনতুল্য ধনীর ভোগবিলাসপূর্ণ উত্তুঙ্গ সৌধমালা দরিদ্রের শূন্য পর্ণকুটীরের বিমল পুণ্যময় জ্যোতিতে চিরনিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ঐশ্বর্য্যের কিছুই নাই সত্য, কিন্তু সেখানে হৃদয় আছে, দুঃখীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ও দুঃখ-মোচন করিবার জন্য সরল

প্রাণে চেষ্টা করিবার লোক আছে। হৃদয়বান্ দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার জীর্ণ-পর্ণকুটীরে ক্ষণেকের মধ্যে যে মহৎ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা যে ধনীর ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকাতে নাই, কে না তাহা স্বীকার করিবেন? ভারতীয় আর্য্যপর্ণকুটীরের অতুল মাহাত্ম্যে আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি!

প্রয়াগের পর্ণকুটীরে বন্যফলমূলাশী কৌপীনধারী ভরদ্বাজ মুনি স্বীয় তপঃপ্রভাবে রামমাতা কৌশল্যা, রামানুজ ভরত, শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যাবাসিগণের সৎকারের জন্য এই মর্ত্ত্যে যে বিপুল স্বর্গীয় সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রনিবাসী উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ, অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে সামান্য শক্তুপ্রস্থদানে যে মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যে পবিত্র যজ্ঞভূমিতে লুণ্ঠিতকায় নকুলের অর্দ্ধাঙ্গ দিব্যকাঞ্চনময় রূপ ধারণ করিয়াছিল, যে যজ্ঞের অতুল মহিমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকেও নিষ্প্রভ করিয়াছিল, বজ্রনির্ঘোষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিরাট সভায় নকুল যে যজ্ঞের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, ভারতভাগ্যে এখনও সেই পুণ্য ও তপঃপ্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীর মাহাত্ম্য এখনও ভারতকে সজীব রাখিয়াছে!

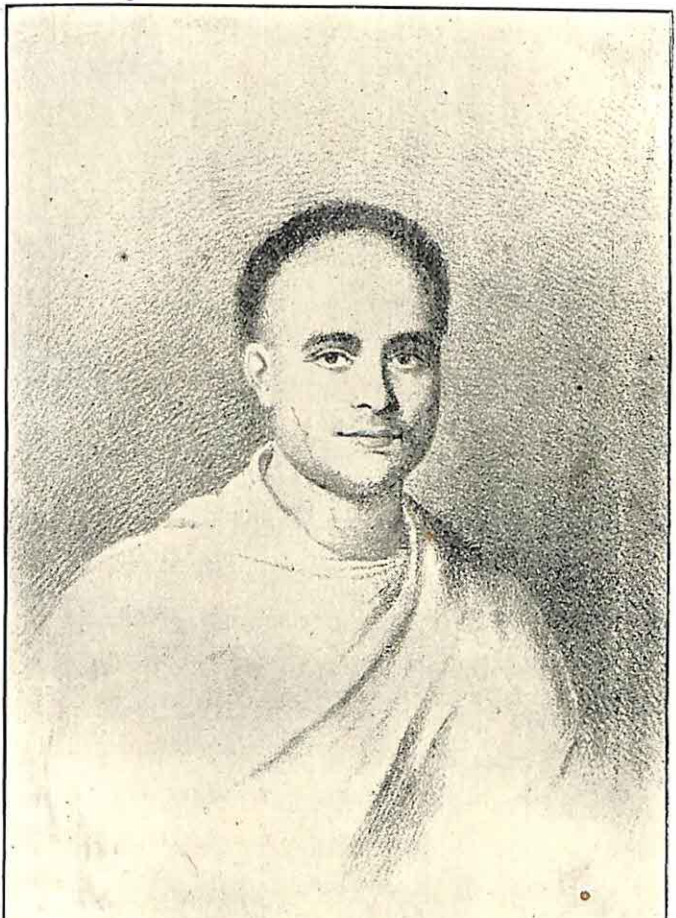

বিদ্যাসাগর।

The Emerald Ptg. Works.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগরের জন্ম।

যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হেতু আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিবলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে পরিচালিত করেন, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা নৃপমণ্ডলীরও গুরুস্থানীয়। রাজগণ ইঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সমাজশাসনে সমর্থ হয়েন। এই নিয়মে, ভারতবর্ষে ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এইজন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম—সমগ্র ভারতের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপ খণ্ডেও হোমর, ভার্জ্জিল, গেলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোমৎ, দান্তে, সেক্ষপিয়র প্রভৃতির স্থানও সেইরূপ।

যাঁহাদিগের মধ্যে অলৌকিক প্রতিভা অথবা ধর্ম্মজ্ঞান বা বিশ্বপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই, তাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ মনে করিয়া পূজা করি। কিন্তু গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ন্যায় বিশ্বপ্রেম, প্রতিভা ও

ধর্ম্মজ্ঞানের ত্রিধারা যাঁহাতে সম্মিলিত দেখিতে পাই, তাঁহাকে বিরাট মহাপুরুষ বলিয়া বন্দনা করি। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপে যেরূপ অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, জন্ম বৃত্তান্তও সেইরূপ অসাধারণ ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাপূর্ণ বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মবৃত্তান্তও এইরূপ কিছু বিচিত্রতাপূর্ণ বলিয়া জনশ্রুতি আছে এবং তাহা অমূলক নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরদাস কার্য্যক্ষম হইলে, রামজয় পুনরায় তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম ও অন্য নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে কেদারনাথ পাহাড়ে অবস্থিতি করেন। দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের কোন সংবাদ রাখেন নাই। রামজয় এক দিবস (কেদারনাথ পাহাড়ে) নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, "রামজয়, তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করিতেছ ? স্বদেশে যাও,তোমার বংশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া, নিরন্তর বিদ্যাদান ও নিরুপায় লোকদিগের ভরণ পোষণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ দ্বারা তোমার বংশে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন।" রামজয়, পাহাড়ের মধ্যে নিশীথ সময়ে এরূপ অসম্ভব স্বপ্নদর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুদিন অতীত হইল, সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া নিভৃত স্থানে ঈশ্বরারাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহারা কি করিতেছে ও কে আছে না আছে, তাহাও জানি না। এবম্বিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হইলে, পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন বলিতেছে, "রামজয়,তুমি পরিবারগণের

নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না, তোমার প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া, রামজয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবিরত ৬ মাস পদব্রজে গমন করিয়া, বীরসিংহে সমুপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার পুত্র ঠাকুরদাস কলিকাতায় বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র কালিদাসের বিবাহকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের পত্নী ভগবতী দেবী গর্ভবতা হইয়া অবধি উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছেন। অনন্তর রামজয় দেশে আগমন করিয়াছেন এ সংবাদ কলিকাতায় পুত্রদ্বয়ের নিকট প্রেরিত হইল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই বহুকালের পর পিতৃপদ সন্দর্শনার্থে ঠাকুরদাস ও কালিদাস কলিকাতা হইতে বীরসিংহে আগমন করিলেন।

১৭৪২ শকাব্দা অর্থাৎ সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বীরশিশু ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ ক্ষুদ্র পল্লীতে দরিদ্র ঠাকুরদাসের পর্ণকুটীরে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সূতিকাগৃহের দ্বারে সমাগত পল্লীবাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে ক্ষুদ্র পল্লীখানি কম্পান্বিত হইল। বার্ত্তাবহ সমীরণ প্রতিধ্বনি বহন করিয়া দ্বারে দ্বারে মহাপুরুষের জন্মবার্ত্তা বিঘোষিত করিলেন। এবম্প্রকার মাঙ্গল্য অভ্যর্থনার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম সূর্য্যের আলোক দেখিলেন। তীর্থক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে আল্‌তার দ্বারা ভূমিষ্ঠ বালকের জিহ্বার নিম্নে কয়েকটী কথা লিখিয়া, তাঁহার পত্নী দুর্গাদেবীকে বলিলেন,—"লেখার নিমিত্ত শিশুটী কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় নাই; বিশেষতঃ কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায়, এই বালক কিছুদিন তোত্‌লা হইবে। এই বালক ক্ষণজন্মা,

অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইবে। এই বালক জন্মগ্রহণ করায়, আমার বংশের চিরস্থায়ী কীর্ত্তি থাকিবে। ইহাকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। এই বালককে অপর কেহ যেন মন্ত্র না দেয়; অদ্য হইতে আমিই ইহার অভীষ্টদেব হইলাম। এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য; অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বর রাখিলাম।"

আজ রামজয় তীর্থক্ষেত্রের সেই স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া সূতিকাগৃহে পিতামহ কর্ত্তৃক যে নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, সেই 'ঈশ্বরচন্দ্র' নামেই তিনি উত্তরকালে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যৎকালে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেবী দশ মাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন। দুর্গাদেবী বধূর রোগাপনয়নের জন্য কতই প্রতিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। তৎকালে কোন কোন বৃদ্ধা দুর্গাদেবীকে বলিতেন, তোমার বধূমাতাকে ভূতে পাইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলিতেন, ডাইনী পাইয়াছে। এই সকলের রোজা আনাইয়া দেখান হয়, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি ঐ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। রোগের তথ্যানুসন্ধানবিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল। ইনি রোগ নির্ণয়ের পূর্ব্বে রোগীর কোষ্ঠী গণনা করিতেন। ইনি দুর্গাদেবীকে বলিলেন, "আপনার বধূমাতার আমি রোগ নির্ণয় করিলাম, এক্ষণে ইহার কোষ্ঠী দেখিতে ইচ্ছা করি।" চিকিৎসক ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্তরূপ কথা বলিলে

দুর্গাদেবী তাঁহার কোষ্ঠী দেখিতে দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভবানন্দ গণনা করিয়া বলিলেন, ইঁহার কোন রোগ নাই; ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃ প্রভাবে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ঔষধ সেবন করাইবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগমুক্তা হইবেন। ভবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল। প্রসবের পরক্ষণেই ভগবতী দেবীর আর কোন উন্মাদচিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। এ কারণ, দুর্গাদেবী সর্ব্বদা ভবানন্দ ভট্টাচার্য্যের গণনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে, ঠাকুরদাস দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য অতি সন্নিহিত কুমারগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন। তথা হইতে বাটীতে আসিতেছেন দেখিয়া, রামজয় কিছু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরদাস, অদ্য আমাদের একটী এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" তৎকালে গৃহে একটী গাভীও গর্ভিনী হইয়াছিল। ঠাকুরদাস মনে করিলেন, গর্ভবতী গাভীটী প্রসব করিয়াছে। তিনি বাটী প্রবেশ করিয়া গোশালায় গমন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন গাভী প্রসব করে নাই। তখন রামজয় ঈষৎ হাস্যবদনে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "এছেলে এঁড়ের মত বড় একগুঁয়ে হইবে। ইহার প্রতিজ্ঞা হিমাদ্রির ন্যায় অটল অচল রহিবে এবং প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইবে, একারণ এঁড়ে বাছুর বলিলাম। ইহার দ্বারা উত্তরকালে দেশের বিশেষরূপ উপকার হইবে। তুমি ইহাকে সামান্য এঁড়ে জ্ঞান করিবে না, এ নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র জয়ী হইবে, এই বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও দয়ার অবতার হইবে, ইহার যশো-

গীতিতে সমগ্র বঙ্গভূমি ধ্বনিত হইবে, এই বালক ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আমার বংশে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিলাভ হইল। আজ আমার স্বপ্নদর্শন সত্য হইল।"

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরপরায়ণ সাধু মহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের হৃদয়শায়ী ভূতভাবন ভগবান্ ভূতকল্যাণের জন্য তাঁহাদের মুখ দিয়া যাহা বলান, তাঁহারাও ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাহাই বলেন। এই সকল সারবান্ উক্তিই মহাপুরুষের মহাবাক্য নামে খ্যাত। তীর্থপর্য্যটনকারী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ঈশ্বর-পরায়ণ রামজয়, বারশিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন,ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ তাঁহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেইজন্য,তিনি ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইয়া সদ্যোজাত শিশুর সম্বন্ধে যে সকল ভাবী উক্তি বলিয়াছিলেন, সেই সকল উক্তিই উত্তরকালে ঈশ্বর-চন্দ্রের জীবনে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুক্ষণ পরে গ্রহবিপ্রশ্রেষ্ঠ কেনারাম আচার্য্য আসিয়া বালকের ঠিকুজী প্রস্তুত করিলেন। ঠিকুজী প্রস্তুত করিবার কালে, ফল বিচার করিয়া কেনারাম বিস্মিত হইলেন। কোষ্ঠী গণনায় ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পাওয়া যায়। আচার্য্য গণনার দ্বারা ব্যক্ত করিলেন,—"এই বালক ক্ষণজন্মা ; উচ্চ গ্রহ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এরূপ ফল কাহারও কোষ্ঠীতে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। এ বালক জগদ্বিখ্যাত নৃপতুল্য ও দয়াময় হইবে, এবং দীর্ঘায়ু হইয়া নিরন্তর ধন ও বিদ্যাদান করিয়া, সাধারণের দুঃখনিবারণ করিবে।"

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যশালিনী, জ্ঞান-ভক্তি-প্রসবিনী ভূকৈলাস ভারত-ভূমি পুণ্যের লীলাক্ষেত্র। এই পুণ্যক্ষেত্রে কত মহাত্মাই জন্মগ্রহণ

করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়াছেন, কত অমূল্য সত্যরত্ন দান করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সেই পুণ্য-ভূমি ভারতভূমি, যেখানে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি স্রোতস্বিনীগণ প্রবাহিত হইয়া দেশকে পবিত্র করিতেছে। এই সেই পুণ্যভূমি ভারতভূমি, যেখানে আর্য্যকুলতিলক ঋষিগণ মনোহর আশ্রমে উপবেশন করিয়া সমতানে সমস্বরে সেই আদি-দেবের স্তুতিবাদ করিতেন, আর সামগানে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। এই সেই দেবলোক ভারতভূমি, যেস্থানের নৈমিষারণ্যে শ্বেতশ্মশ্রুধারী, দীর্ঘকায়, তেজঃপুঞ্জ, শুদ্ধচেতা মুনিগণ ভগবদ্ভক্তিরস পান করিতে করিতে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করিতেন। এই সেই দেব-লোক ভারতভূমি,যেখানে ধ্যানস্তিমিতলোচন সমাধিস্থ যোগিগণ একান্তমনে পর্ব্বতকন্দরে বা সরযূতটে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া চিদানন্দ পুরুষের দর্শনে অপার যোগানন্দ সম্ভোগ করিতেন : এই সেই পুণ্যের লীলাক্ষেত্র ভারতভূমি, যেখানে বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক আবির্ভূত হইয়া পতিত নর-নারীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। এই সেই পুণ্যের লীলাক্ষেত্র ভারতভূমি যেখানে কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, কবীর, রামানুজ, রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। ভারতভাগ্য চিরদিনই এইরূপ বিধাতার অযাচিত অনুকম্পালাভে সুপ্রসন্ন।

বিধাতার রাজ্যে একাদিক্রমে অন্যায় অত্যাচার অধিকদিন রাজত্ব করিতে পারে না। মানবজীবন ধারাবাহিকরূপে অধিক দিন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। জনসমাজ দুরাচারী পাপ-ভারাক্রান্ত

লোকদিগকে বহন করিয়া অধিক দিন যন্ত্রণাভোগ করিতে অসমর্থ। যিনি ত্রিভুবনপালক বিশ্বনিয়ন্তা, তিনি নিয়ত জাগ্রত থাকিয়া এই মানব-জীবনের পরিচালক হইয়া স্থিতি করিতেছেন। তিনি মানবমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক গতি ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুগে যুগে নানা প্রকার লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। সেই জন্য দেখিতে পাই ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, সমাজসংস্কার ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সময়ে অবনীমণ্ডলে এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। মহাত্মা রামমোহন, ডেভিড্ হেয়ার, রামকমল, রাধাকান্ত যে কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য অলৌকিক পৌরুষ ও প্রতিভাশালী, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও সহিষ্ণু, দয়া ও প্রেমের অবতার, এক বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য, বঙ্গের শুভদিনের সুপ্রভাতে বীরসিংহ ক্ষুদ্র পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের পর্ণকুটীরে বীরশিশু ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন। পুণ্যশীলা বীরমাতা ভগবতী দেবীর পবিত্র অঙ্কে বিরাজমান হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিশুচর্য্যা ও সন্তানশিক্ষা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, এবং যতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে গতিবিধি করিতে না পারে, ততকাল জননীর শিক্ষাধীন থাকিয়া, শশিকলার ন্যায় অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে প্রতিনিয়ত জননীর নিকটে অবস্থিতি করায় শিশু যে সকল শিক্ষা লাভ করে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তৎসমুদয়ের বিকাশ ভিন্ন বিনাশ হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। সন্তানবৎসলা জননীর অকৃত্রিম স্নেহের প্রভাব এতই প্রবল যে, শিশু তাঁহারই প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত হয় এবং তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং মাতার দোষ গুণ সন্তানেই সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

যে শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়, শৈশবেই তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে। এ সময়ে সাধারণতঃ শিশুর অনুসন্ধিৎসা ও অনুকরণ প্রকৃতি অতিশয় প্রবলা থাকে। শিশু ইতস্ততঃ যাহা কিছু নিরীক্ষণ করে, সে সকল তাহার নিকটে নূতন ও অপরিচিত, সুতরাং সে যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই তৎসমুদয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং সেই সমুদয় বিষয়ের বিশ্লেষণ তাহাকে যাহা বলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই সে অভ্রান্ত —

বলিয়া গ্রহণ করে। ফলতঃ বাল্যকালে যাহা একবার শিক্ষা করা যায়, তাহা চিরকাল স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান থাকে। অতএব এ সময়ে শিশুর পুরোভাগে এরূপ সকল আদর্শ রাখা উচিত, যাহাতে তাহার সুকুমার মনোবৃত্তিনিচয় সজীব হয় এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্র লাভ করিতে তাহাকে শক্তিশালী করে ;. এই সময়ে হৃদয়ে জ্ঞানের যে রেখাপাত হয়, উত্তরকালে তাহাই অধিকতর রঞ্জিত ও বর্দ্ধিত হয় মাত্র। অতএব শিশু যেরূপ পরিবার মধ্যে থাকিয়া লালিত পালিত হয়, তাহার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির বিকাশও যে তদনুরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

লর্ড ব্রোহাম বলেন, শিশু আঠার হইতে ত্রিশ মাসের মধ্যে বহির্জগতের বিষয়, তাহার স্বকীয় ক্ষমতা, অন্যান্য বস্তুর প্রকৃতি, এমন কি আপনার ও অপরের মন সম্বন্ধে এত অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, তাহার অবশিষ্ট সমগ্র জীবনে সে আর তত শিক্ষা লাভ করে না। এই সময়ে শিশু চিরজীবনের শিক্ষার বীজ সংগ্রহ করে। সুতরাং অতি শৈশব কাল হইতেই শিশুর সুশিক্ষার বিধান করা অতীব প্রয়োজন। জনৈক মহিলা কোন্ সময়ে তাঁহার চারি বৎসর বয়ঃক্রম সন্তানের শিক্ষার সূত্রপাত করিবেন, এই কথা যেমন ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "ভদ্রে! এখনও যদি শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিয়া না থাক, তবে এই চারি বৎসর বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে।" জনক জননী ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সংসারে শিশুর সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। জননীর উদার বা অনুদার প্রকৃতি, তাঁহার কুসংস্কার তমসাচ্ছন্ন অথবা দিব্য জ্ঞানালোক পরিস্ফুট প্রকৃতি নিচয়ই শিশুর জীবন পথের পরিচালক। সুতরাং মাতার এক একটী সদনুষ্ঠান বা অসদনুষ্ঠান,

তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, স্বভাব, চরিত্রের উপর শিশুর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম ও সাধুতা রক্ষা করিবার ভার রমণীর হস্তে। জননী যদি ধর্ম্মপরায়ণা ও বিবেকশালিনী হন, তাঁহার অন্তরে যদি সাধুতা লাভের ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তানগণও সেই সকল সদ্গুণ লাভ করে। স্নেহময়ী মাতার অধরনিঃসৃত সুমিষ্ট অনুশাসন বাক্য সন্তানের স্মৃতিপটে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শত শিক্ষকের উপদেশে যে শিক্ষায় লাভ না হয়, একটী সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা সংযত-চিত্তা, বিবেকপরায়ণা মাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলে, সন্তানদিগের সে শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। মহৎ লোকের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জগতে যত মহাজন যে যে সদ্গুণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলে, এরূপ পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁহাদের জননীগণ এই সকল চরিত্র গুণে গুণবতী ছিলেন।

ত্রিভুবনবিজয়ী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিরতিশয় হরিবিদ্বেষী ছিলেন। হরির নাম শুনিলেই তিনি ক্রোধে অধীর হইতেন। তাঁহার রাজ্যের চতুঃসীমাতেও কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। এমন হরিদ্বেষী গৃহেও, হরিভক্তিপরায়ণা, রাজমহিষী কয়াধূর ভক্তির ফলে, প্রহ্লাদের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু এতদূর ধর্ম্মপরায়ণতা ও ভগবানের প্রতি এত আত্ম নির্ভরের ভাব কোথায় শিক্ষা করিল? সকলেই জানেন, যে প্রেম কয়াধূর হৃদয়ে, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু প্রহ্লাদের হৃদয়ে ভক্তিমন্দাকিনীতে পরিণত হইয়াছিল।

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, বিমাতা সুরুচির দুর্ব্বাক্য বাণে বিদ্ধ হইলে পর জননীর নিকটে উপস্থিত হইয়া অতি কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে, ধর্ম্মশীলা, সহিষ্ণু ও বিবেক-পরায়ণা জননী সুনীতি, যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতি মহৎ, অতি উচ্চ। তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন "বৎস! কাঁদিও না; এই পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্য্যের গুণেই বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, পুণ্যলাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্যলাভ করিলে, সকল ফল লাভ হইবে। বিনয়ী, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরহিতব্রতী হও; জল যেমন নিম্নাভিমুখেই ধাবমান হয়, এই সকল গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বসম্পদ অনায়াসেই তোমাকে আশ্রয় করিবে। সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্ আমাদের মঙ্গল করিবেন, তুমি তাঁহার শরণ লও।" এরূপ ক্ষমাশীলা, পুণ্যবতী জননীর সন্তান বলিয়াই, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের হৃদয় পুণ্যের পবিত্র ও বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল; ধ্রুব কঠোর তপঃপ্রভাবে, পদ্মপলাশ-লোচন হরির কৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

থিওডোর পার্কার স্বীয় জীবনচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি যখন পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তখন একদিন তাঁহার পিতার সঙ্গে বাড়ীর বহির্ভাগে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া গৃহে জননীর নিকটে একাকী প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছিলেন, পথে দেখিলেন, একটী কূর্ম্মশিশুকে অপর কতিপয় শিশু প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তিনিও বালস্বভাব বশতঃ প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন, কিন্তু কে যেন তাঁহাকে হঠাৎ নিষেধ করিল। তিনি মাতার নিকটে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! কূর্ম্মশিশুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, আমাকে কে নিষেধ করিল?" জননী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, "বৎস, লোকে উহাকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি বলি, উহা ঈশ্বরের বাণী। তিনি তোমাকে অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। তুমি যদি এইরূপ সর্ব্বদা তাঁহার নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চল, তাহা হইলে সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ করিতে পারিবে।" পার্কার বলিয়াছেন, ঐ দিনের ঘটনাটী ও মাতার ঐ উপদেশবাক্যটী চিরকাল তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল।

শতবর্ষাধিক অতীত হইল, কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে স্যার উইলিয়ম জোন্স নামক একজন বিচক্ষণ বিচারপতি ছিলেন। জোন্স যখন তিন বৎসরের শিশু, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার সুশিক্ষিতা মাতার উপরই তাঁহার শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়, তাঁহার জননী অসাধারণবিদ্যাবতী রমণী ছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই মাতার যত্নে পাঠের প্রতি জোন্সের রুচি জন্মিয়াছিল। তিনি যখন দুই তিন বৎসরের বালক, তখন কোন নূতন বিষয় দেখিয়া, তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেই, মাতা বলিতেন, "পড়, পড়িলেই জানিতে পারিবে।" জননীর মুখে এই কথা বারম্বার শ্রবণ করায়, শিশু জোন্সের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তাঁহার এই অনুরাগ পঠদ্দশাতেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ ব্যতীত অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন। পঠদ্দশাতেই তিনি গ্রীক ও লাটিন এবং স্বকীয় যত্নে ভিন্ন দেশীয় চারি পাঁচটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, কতিপয় বৎসর পর, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার বাসনা তাঁহার এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, অবশেষে তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন রাজধানী কলিকাতা নগরীতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়া, সে বাসনাও চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

জননীর সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া সন্তান অধর্ম্ম পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। ভাগ্যবলে মণিকার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা সুধীরা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, দুষ্ক্রিয়াসক্ত সেণ্ট অগাষ্টিনের স্বকীয় দুর্দ্দশার জন্য ঘোরতর আত্মগ্লানির উদয় হইয়াছিল। এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতরকণ্ঠে আপনার পাপ স্বীকার পূর্ব্বক জগদীশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়াছিলেন,—"হে পরমেশ্বর! আমি তোমার দাসীর পুত্র, তোমার বাঁদীর সন্তান, তোমার চিরানুগত পরিচারিকার ধন।"

সন্তানের উপর মাতার প্রভাব যে অতি গুরুতর এবং মাতার ধর্ম্ম-শীলতা, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর যে সন্তানের ও সমাজের ভাবী শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফ্র্যান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট স্বীয় জননীর আদেশ ভিন্ন অপর কাহারও আদেশ মান্য করিয়া চলিতেন না। তাঁহার যে মাতা সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ শাসন ও ন্যায়ানুষ্ঠান দ্বারা সন্তানকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও ভক্তিপ্রবণ হইতে এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ-রমণী

জননীর নিকটই শৈশবকালে তিনি বাধ্যতা গুণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শৈশবের আশ্রয়স্থল জননী ক্রোড়েই তিনি ধর্ম্মে বীর, নীতিতে অটল, অধ্যবসায়ে সুদৃঢ় ও উৎসাহে জ্বলন্ত বহ্নিশিখাবৎ গঠিত হইয়াছিলেন।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট এডাম বলেন, "শৈশবে আমি মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের নিদান সুশিক্ষিতা ও সম্পূর্ণরূপে সন্তানপালনে সমর্থা জননী লাভ করিয়াছিলাম। এবং তাঁহার নিকট যে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা আমার চিরজীবন সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে।"

শিশু বিদ্যাসাগর সকলের চক্ষের অগোচরে, জননীর স্নেহময় বক্ষে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগ্যে এডামের ন্যায় বিদ্যাবতী জননীলাভ ঘটে নাই। কারণ, বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে স্ত্রীজাতি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা ভূর্জ্জপত্রে লিখিতেন। তাঁহারা নানা বিষয় শিক্ষা পাইতেন। সংস্কৃত দশকুমারচরিত নামক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে. স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা, চিত্রবিদ্যা, পুষ্পবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা, সঙ্গীত, তর্কবিদ্যা, গণনা, বাক্যবিন্যাস, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ বিদ্যা, জীবিকানির্ব্বাহক অর্থকরী প্রমুখ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু হায়। যে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা এক সময়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; যে ভারতে, দেবযানী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, রোমশা, ও বাক্ প্রভৃতি বিদুষী বনিতারা বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন ; যে ভারতে,ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী জ্যোতিষ

শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া স্বনামে জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচার করিয়া জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন ; যে ভারতে অনসূয়া, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী, শৈব্যা, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন ; যে ভারতে, এমন দিন ছিল, যখন বারাণসী নগরীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া হটি বিদ্যালঙ্কার নামে এক বিখ্যাত রমণী, ছাত্রদিগকে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন ; যে ভারতে, মিহিরের স্ত্রী খনা, জ্যোতির্বিদ্যা ও তাহার রচনার জন্য বিখ্যাত আছেন ; যে ভারতে, চিতোরের রাণী মিরাবাই, আপন কবিত্বশক্তিগুণে জয়দেবের ন্যায় সুমিষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন ; যে ভারতে, পৃথ্বীরাজলক্ষ্মী পদ্মাবতী, চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন ; যে ভারতে, মালাবারে আভীর নামে একটী অবিবাহিতা বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক নীতি, কাব্য ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক সকল রচনা করিয়া পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন ; যে ভারতে, নানা শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকেরাও নানাপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ভারতে স্ত্রীশিক্ষা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমে এদেশের লোকের এতাদৃশ কুসংস্কার জন্মে যে, নারীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিলে, তাহাদের বৈধব্য দশা ঘটিবে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা তৎকালে এবম্বিধ অকিঞ্চিৎকর ও অমূলক ভয়ে বিদ্যাভ্যাসে অনুরক্তা হইতেন না। দেশে যখন স্ত্রীশিক্ষার পথ এইরূপ ভাবে নিরুদ্ধ, তখন স্ত্রীলোকগণ গৃহপালিত পশুবৎ জীবন যাপন করিতেন, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। তখন, চরিত্রগত এবং অনুষ্ঠানগত শিক্ষাই দেশকে সজীব রাখিয়াছিল। তখন দেশে শাস্ত্রকথা, কথকতা, রামায়ণ, মহা-

ভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ আদর্শ হিন্দুগৃহে প্রতিদিন ধ্বনিত হইত এবং এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই দেশের ধর্ম্মভাব ও নৈতিকভাব জাগরিত রাখিয়াছিল।

তখনকার জননীগণ রত্নাকরের মুক্তি, হরিশ্চন্দ্রের স্বার্থত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়নিষ্ঠা, ভীষ্মের শরশয্যাতে শয়ন, অর্জ্জুনের রণকৌশল ও বাহুবল, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবৎসলতা, লোকরঞ্জনের জন্য স্বার্থত্যাগ, লক্ষ্মণের অগ্রজানুরাগ, সতী সাবিত্রীর পতিভক্তি প্রভৃতি উপাখ্যান গুলি সন্তানশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া মনে করিতেন। তখনকার সন্তানগণ মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতির মুখের অন্নে অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, অপরিচিত রুগ্নব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা, বিপন্নকে আশ্রয়দান, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিতে দেখিয়া পরোপকার ও সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিত। গ্রামের সামান্য লোকদিগের সহিতও ধনশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও এক একটী সম্বন্ধ থাকিত, কেহ কাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। এইরূপে তাহারা দয়াশীল, হৃদয়বান্ ও মিষ্টভাষী হইতে শিক্ষা পাইত। পূর্ব্বে আদর্শপরিবারে বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, গৃহের সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মধ্য দিয়া সন্তানগণ সুশিক্ষা লাভ করিত। দেশে এই সকল সুভাব ও সদুদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল বলিয়াই দেশ প্রাণহীন বা হৃদয়বিহীন হয় নাই। তখনকার জননীগণ সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান শিক্ষিতা জননীগণের ন্যায় বেন, গাল্টন, হারবার্ট স্পেন্সার, স্মাইল, কারপেণ্টার, ফাউলার * প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মন্তব্য

* Bain's Education as a science, Gulton's Heriditary Genius, Education by Herbert Spencer, Smile's Character, Human Physio-

পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই সত্য বটে, কিন্তু ঋতধ্বজ রাজপত্নী মদালসা কিরূপ সদুপদেশ দানে সাধু অলর্কের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে যে মহামূল্য উপদেশ রত্নদান করেন, তন্মধ্যে সন্তানের উপর মাতার প্রভাবের বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রে গার্হস্থ্যধর্ম্ম কথনের মধ্যে সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে যে উপদেশের উল্লেখ আছে * এবং

logy by Dr. Carpenter, Love and Parantage applied to the improvement of offspring by O. S. Fowler.

* গার্হস্থ্য ধর্ম্ম :—শ্রীদেবী কহিলেন :—বিভো! গৃহস্থগণের ধর্ম্ম কি? ভিক্ষুকগণের ধর্ম্মই বা কিরূপ? ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যান্য বর্ণসমূহের সংস্কার প্রভৃতিই বা কিরূপ? তৎসমুদায় আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

শ্রীসদাশিব কহিলেন। কৌলিনি! গার্হস্থ্য ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গের প্রথম ধর্ম্ম (ও সকলের মূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে)। অতএব সর্ব্বাগ্রে গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

গৃহস্থগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে। তাহারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তৎসমুদায়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। গৃহস্থগণ কাহারও নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না; সর্ব্বতোভাবে কপটতাচরণ পরিত্যাগ করিবে; এবং তাহারা দেবতা ও অতিথি পূজায় নিরত থাকিবে। গৃহস্থগণ মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবে। শিবে! দেবিপার্ব্বতি! যে ব্যক্তি মাতাপিতার সন্তোষসাধন করে, তুমি তাহার প্রতি প্রীতা হইয়া থাক এবং পরমব্রহ্মও তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। আদ্যে! তুমিই জগতের মাতা এবং পরাৎপর পরমব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে সকল গৃহস্থ ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবা দ্বারা তোমাদের উভয়ের সন্তোষসাধন করে, তাহাদিগের সেই তপস্যা হইতে আর অন্য উৎকৃষ্টতর তপস্যা কি আছে? গৃহস্থ ব্যক্তি যথোপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য বস্তু প্রভৃতি প্রদান করিতে থাকিবে।

বিবিধ উপাখ্যানের অন্তর্গত উপদেশাবলী সেই সময়ে প্রত্যেক আদর্শ হিন্দুগৃহে মুখে মুখে গীত হইত এবং সন্তানশিক্ষার উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইত।

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদুল বাক্য শ্রবণ করাইবে; সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং নিয়ত পিতামাতার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। যদি গৃহস্থ আপনার হিতকামনা করে, তাহা হইলে, সে কদাপি মাতাপিতার নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না। তাঁহাদিগের সমীপে তর্জ্জন গর্জ্জন বা কুবচন প্রয়োগও করিবে না; মাতাপিতাকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিবে; পরে তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে আসনে উপবিষ্ট হইবে না; এবং তাঁহাদিগের আদেশ পালনে সতত উন্মুখ হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি বিদ্যামদে বা ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে অবহেলা করে, সে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে। যদি প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তথাপি গৃহস্থগণ মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অতিথি ও সহোদর ইহাদিগকে না দিয়া কদাপি স্বয়ং ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি স্বজনগণকে না দিয়া স্বকীয় উদর পূরণার্থে ভোজন করে, সে ইহলোকে অতীব নিন্দিত হয়, এবং পরলোকেও ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই যে, ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে; স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের ভরণপোষণ করিবে। ইহাই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। জননী দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জন্মদাতা জনক হইতে দেহের উৎপত্তি হয়, এবং স্বজনগণ প্রীতিবশত শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নরাধম (তাহাতে সন্দেহ নাই।) মহেশানি! গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনগণের নিমিত্ত শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিরন্তর শক্তি অনুসারে ইহাঁদের সকলের সন্তোষ সাধন করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম করে পৃথ্বীতলে সেই মহাপুরুষই ধন্য, সেই মহাপুরুষই কৃতী এবং সেই মহাপুরুষই পরমার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। ভার্য্যা যদি পতিব্রতা ও সাধ্বী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ কদাপি

এ পর্য্যন্ত সন্তানের উপর মাতার প্রভাব এবং তৎকালীন আদর্শ হিন্দু পরিবারের অনুষ্ঠানগত ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় কথিত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন দ্বিবিধ শিক্ষা ছিল—অনুষ্ঠানগত

তাহাকে প্রহার করিবে না, অধিকন্তু নিরন্তর মাতার ন্যায় পরিপালন করিবে এবং ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

* * * * * *

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি * * * কোন স্ত্রীকে অযুক্ত কথা বলিবে না; এবং স্ত্রীলোকের উপরি শৌর্য্য প্রদর্শনও করিবে না। ধন-প্রদান বসন-প্রদান প্রেম-প্রদর্শন শ্রদ্ধা-প্রকাশ অমৃততুল্য মধুর বচন প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর ভার্য্যার সন্তোষসাধন করিবে; কদাপি কোন বিষয়ে তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। সুবুদ্ধি ব্যক্তি উৎসবে, লোক-যাত্রায়, তীর্থে এবং পরগৃহে পুত্র অথবা আত্মীয় কাহাকেও সমভিব্যাহারে না দিয়া কদাপি একাকিনী পত্নীকে প্রেরণ করিবে না। মহেশানি! যে পুরুষের প্রতি পতিব্রতা ভার্য্যা পরিতুষ্টা থাকে, সে নিখিল ধর্ম্মকর্ম্ম-করণজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং তোমার প্রীতিভাজন হয়। পিতা চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা ও (দয়া দাক্ষিণ্য শিষ্টাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠতা, পরোপকার-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি) গুণসমূহ শিক্ষা প্রদান করিতে থাকিবে; অনন্তর বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে নিয়োজিত রাখিবে; তৎপরে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে।

এইরূপে কন্যাকেও পালন করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিবে। পরে ধনরত্নে বিভূষিতা করিয়া জ্ঞানবান বরকে সম্প্রদান করিবে; অর্থাৎ চারি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লালনপালন করিয়া তৎপরে ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সদ্‌গুণ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবে; অনন্তর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া গৃহকর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিবে। পরন্তু পুত্র হইতে কন্যার বিশেষ এই যে, উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইলে, যথাসময়ে ঐ কন্যাকে ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া সম্প্রদান করিতে হইবে।

এবং চরিত্রগত শিক্ষা। ভগবতী দেবীর চরিত্রগত শিক্ষা কি কি ছিল, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা আমরা যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, সেই সমুদয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

গৃহস্থগণ এইরূপে ভ্রাতৃবর্গ, ভগিনীবর্গ, ভ্রাতুস্পুত্রবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, মিত্রবর্গ, ও ভৃত্যবর্গের যথাক্রমে ভরণপোষণ, পরিপালন এবং তাহাদিগের তুষ্টিবর্দ্ধন করিবে। অনন্তর গৃহস্থ (সমর্থ হইলে) স্বধর্ম্ম-নিরত মানবগণ, একগ্রামবাসী জনগণ, অভ্যাগত অতিথিগণ ও উদাসীনগণকেও যথাশক্তি প্রতিপালন করিবে। দেবি! বিভবসত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এইরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে সে ঘোর পাপে লিপ্ত, লোকনিন্দিত ও পশুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

গৃহস্থগণ নিদ্রা, আলস্য, দেহযত্ন, কেশবিন্যাস, অশন ও বসনে আসক্তি, এতৎসমুদায় অপরিমিতরূপে করিবে না। তাহারা পরিমিত ভোজন ও পরিমিত নিদ্রা সেবন করিবে; পরিমিতভাষী * * * হইয়া থাকিবে; কপটতা পরিহার করিবে; এবং সতত বিশুদ্ধাচার, সর্ব্বকর্ম্মে নিরালস্য ও উদ্যোগশীল এবং নম্র হইয়া কালাতিপাত করিবে। তাহারা শত্রুর নিকট শূরত্ব এবং বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনসমীপে বিনয় প্রদর্শন করিবে; নিন্দিত-জনগণকে আদর করিবে না; মানী জনগণের সম্মান রক্ষা করিবে; সহবাস ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে। শত্রু লঘু হইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে ভয় করিবে, এবং সময় বুঝিয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে; পরন্তু কোনক্রমে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিবে না। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পরের উপকার করিবার নিমিত্ত যাহা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না; স্বীয় যশ ও পৌরুষের পরিচয় প্রদানও করিবে না; এবং পরের কথিত গুপ্ত কথাও কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না। নিশ্চয় জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও যশস্বী ব্যক্তি কদাপি লোকগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গুরু বা লঘু ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে না; বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিবে, এবং ব্যসন, কুসংসর্গ, মিথ্যাবচন, পরদ্রোহ প্রভৃতি সর্ব্বতো-

তাঁহার চরিত্রের এই এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অসত্যকে সত্যরূপে প্রতীয়মান করিতে অতিশয় ঘৃণা বোধ করিতেন। অনেক জননীকে এরূপ দেখা যায় যে, রোরুদ্যমান শিশু সন্তানগণকে শান্ত করিবার মানসে, কিম্বা অবাধ্য সন্তানদিগকে বাধ্য করিবার অভি-

---

ভাবে পরিত্যাগ করিবে। চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত; অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

গৃহীরা যোগক্ষেমে নিরত থাকিবে; দক্ষ ও ধার্ম্মিক হইবে; বন্ধুগণের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিবে; (সর্ব্বজন সমক্ষে) বিশেষতঃ মাননীয় জনসমূহের নিকট পরিমিতভাষী হইবে; তাঁহাদের নিকট অপরিমিত হাস্যও করিবে না। গৃহস্থগণ জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দীর্ঘদর্শী হইবে; অসৎ বিষয় চিন্তা না করিয়া কেবল সদ্বিষয়েরই আলোচনা করিবে; ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু সমুদায় বিচার না করিয়া ভোগ করিবে না। ধীর ব্যক্তি সতত সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করিবে না।

যে ব্যক্তি জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা ও উৎসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। মাতাপিতা যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সুহৃদগণ যাহাতে অনুরক্ত, মানবগণ যাহার যশোগান করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করে। সত্যই যাহার সনাতন ব্রত, যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি * * * ও পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্য-বিহীন, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি রণে ভীত হয় না, সমরেও পরাঙ্মুখ হয় না, অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। যাহার আত্মা সন্দিগ্ধ নহে, অথচ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও শৈবাচারে নিরত থাকিয়া মদীয় শাসনের বশবর্ত্তী হয়, সেই ব্যক্তিই

প্রায়ে তাঁহারা তাহাদিগকে 'জুজুর ভয়' দেখাইয়া থাকেন। এরূপ ভয় প্রদর্শন যে সন্তানের পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহার দ্বারা শিশুর বল, বিক্রম ও আত্মরক্ষার ভাব সকলই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

কোন কোন জননীকে এরূপ দেখা যায় যে, শিশু যদি তাহার প্রিয় বস্তু পাইবার জন্য ক্রন্দন করে, তবে তাহাকে 'আকাশের চাঁদ' প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া শান্ত করেন। এইরূপ ব্যবহারে শিশুরা অতি সহজেই অন্য সকলকে অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে। এবং ধীরে ধীরে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি তাহাদের সুকোমল বাল্যহৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া কালক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

অনেক মাতার এরূপ স্বভাব আছে যে, তাঁহারা সন্তানগণের নিকট সংসারের অবস্থা গোপন করিতে প্রয়াস পান, এরূপ আত্মগোপন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। কারণ শিশুদিগের অন্যায় প্রার্থনায় তাঁহাদিগকেই জ্বালাতন হইতে হয়।

ভগবতী দেবী সন্তানদিগকে কখন 'জুজুর ভয়' দেখান, কিম্বা তাহাদিগকে শান্ত করিবার মানসে 'আকাশের চাঁদ' ধরিয়া দিবার কথা বলিতেন না। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে সন্তানের যতদূর সম্ভব প্রার্থনা রক্ষা করিতেন এবং স্নেহ ও মমতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে শান্ত

(পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া কি শত্রু কি মিত্র সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া কেবল লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্—অষ্টম উল্লাসঃ।

করিতেন। কঠোর শাসন দ্বারা তাহাদিগের কোমল বৃত্তিগুলির মূলে আঘাত করিতে তিনি কখনই প্রয়াস পাইতেন না। ইহা তাঁহার একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। অবস্থায় যাহা সঙ্কুলান হয়, তাহার অতিরিক্ত প্রার্থনা করিলে, সংসারের দরিদ্র অবস্থা স্মরণ করাইয়া এবং বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন।

সৎকার্য্যে উৎসাহ দান, তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব। শিশু সন্তানদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য ও সদ্ব্যবহার দেখিলে, তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং উৎসাহ দিতেন! একদা বালক বিদ্যাসাগর সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ক্রীড়াশেষে দেখিতে পাইলেন, একজন সঙ্গী ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে আপনার বস্ত্রখানি গ্রহণ করিতে বলিয়া স্বয়ং তাহার ছিন্নবস্ত্রখানি পরিধান করিলেন। গৃহে সমাগত হইলে, মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বস্ত্র কোথায়? বালক উত্তরে সত্য ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। মাতা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এই ত ভাল ছেলের কাজ; আমি চরকায় সূতা কাটিয়া তোমায় আর একখানি নূতন কাপড় প্রস্তুত করাইয়া দিব।" সন্তানগণের এইরূপ সদনুষ্ঠান বা পরোপকারপ্রবৃত্তি দেখিলে, তাহাদিগের প্রতি আদর ও সস্নেহ ভাব প্রদর্শন করা তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন যে, বালক বালিকার জীবনে তিনি যে সকল সৎপ্রবৃত্তি পরিস্ফুট দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ধীরে ধীরে তাহাদের হৃদয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে কি না।

স্নেহ ভালবাসা বর্জ্জিত কঠোর শাসন যে কোমলমতি শিশুর পক্ষে

অতীব অনিষ্টকর, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কঠোর শাসনে শিশু দিনদিন উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আলস্য ভীরুতা ও শঠতা আসিয়া শিশুকে আশ্রয় করে। ভীরুতায় মনুষ্যত্বের লোপ পায়, এ সত্য বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সকলের পক্ষেই সমান। প্রয়োজন হইলে, শিশুকে প্রাণের স্নেহ মমতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাসন করা উচিত। কোন কোন মাতা এরূপ আছেন যে, সন্তানের সামান্য অপরাধে গুরু দণ্ড বিধান করিয়া শেষে তাহাদের গুরুতর অপরাধে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, ইহা অতীব অন্যায়। প্রদীপে একবার হাত দিয়া যন্ত্রণা অনুভব করিলে, শিশু আর কখনও প্রদীপে হাত দিতে যাইবে না। এরূপ স্থলে, মাতার গুরুতর শাসনের প্রয়োজন হয় না। হয় ত কোন সন্তানের অসাবধানতা বশতঃ তাহার হস্তপদ ভগ্ন হইয়াছে, এরূপ স্থলে মাতার অগ্রে সন্তানের জীবন রক্ষার উপায় বিধান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু এরূপ অনেক নির্ম্মম মাতা আছেন যে, তাঁহারা সেই সময়ে ক্রোধপরবশ হইয়া সন্তানকে ভয়ানক তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন। উপস্থিত কর্ত্তব্যের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। ভগবতী দেবীর প্রকৃতি এরূপ ছিল না। বালক বিদ্যাসাগর এক সময়ে ধান্যক্ষেত্রের নিকট দিয়া গমনকালে, ধান্যের শীষ তুলিয়া চিবাইতে চিবাইতে গমন করেন। শেষে ধান্যের শীষের শুঁয়া গলায় আটকাইয়া প্রাণসংশয় হইয়া উঠে। তদবস্থায় বাটীতে নীত হইলে, তাঁহার পিতামহী অতি কষ্টে সেই শুঁয়া বাহির করিয়া দেন, এবং সে যাত্রায় বিদ্যাসাগরের প্রাণরক্ষা হয়। মাতা সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, যাহাতে সন্তান বিপন্মুক্ত হয়, প্রথমতঃ তাহারই সহায়তা সর্ব্বতোভাবে করিয়া শেষে শিক্ষা দিলেন,—"বাবা,

অমুক অমুক শস্যের শীষে শুঁয়া আছে, আর কখন এই সকল শস্যের শীষ চিবাইও না"।

তিনি লোকের আত্মবিশ্বাসের উপর কখন কোন প্রকার আঘাত করিতেন না। তিনি যেন এই আত্মবিশ্বাসের মধ্যে অমিত শক্তি, অমিত বল, কত প্রাণ, কত বীর্য্য, কত ওজ, কত অমৃত নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। অবশ্য সময়ে সময়ে এই আত্মবিশ্বাসের সহায়তা করায় শিশুদিগের দুই একটী ভুল ভ্রান্তি ঘটিত। কিন্তু তিনি বলিতেন যে—"এই ভুলটাই যে একটা মহা শিক্ষা।"

লোকের দোষ অপেক্ষা গুণের উপরই তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল এবং গুণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার দোষকে গুণে পরিণত করিতে সতত চেষ্টা করিতেন। যেমন পাপীকে 'পাপী' 'পাপী' বলিলে, তাহার উদ্ধার অসম্ভব। তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে,সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিতে পারিলেই তাহার পক্ষে মঙ্গল হয়, সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক সেই ভাবেই তিনি কার্য্য করিতেন। কারণ তিনি যেন মনে করিতেন, জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই, যদি কিছু পাপ জগতে থাকে তাহা এই ভয়। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য ; আর যাহাতে তোমার শরীর মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই দুর্ব্বলতা, মৃত্যু বা মহাপাপ। সুতরাং মৃত্যুর সহায়তা না করিয়া জীবনদান করাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ—ধ্বংসসাধন নহে; প্রকৃত শিক্ষার অর্থ—গঠন। সুশিক্ষায় অন্তর্নিহিত শক্তির উপচয়ই হইয়া থাকে ; শক্তির অপচয়ের কোন আশঙ্কাই থাকে না।

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে অতিশয় দুষ্ট ছিলেন। অনেক প্রতিভাবান্

প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির বাল্যজীবনে বালস্বভাবসুলভ চপলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণগণের নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেন; অমর কবি সেক্সপিয়র বাল্যকালে দুষ্ট বালকদিগের সঙ্গদোষে হরিণ চুরি করিয়াছিলেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অত্যাচারে তাঁহার জননী জ্বালাতন হইতেন। বালক বিদ্যাসাগর বাল্যকালে পাড়ার লোকের বাগানের ফল পাড়িয়া চুপে চুপে খাইতেন; কেহ কাপড় শুখাইতে দিয়াছে দেখিলে,তাহার উপর মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। প্রত্যহ পাঠশালায় যাইবার সময় মথুর মণ্ডল নামক একজন প্রতিবেশীর দ্বারদেশে মল ত্যাগ করিতেন। এই সকল সংবাদ মাতার কর্ণে প্রবেশ করিলে, তিনি বিদ্যাসাগরকে বলিলেন,—"বাপু, তুমি লোকের ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, আপনার ভাল কাপড় তাহাকে পরাইয়া,নিজে সেই ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাটীতে আইস, লোকের দুঃখ দেখিলে তুমি মনে এত দুঃখ পাও, আর এরূপ করিয়া লোকের মনে ব্যথা দাও কেন? কোন খাদ্যদ্রব্য হস্তে তাহারা তোমার বিষ্ঠা স্পর্শ করিলে, সেই দ্রব্যগুলি তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতে হয়, পুনরায় স্নান করিতে হয়। আহা, তাহাদের কত কষ্ট দেখ দেখি।" শুনা যায়, মাতার এরূপ শিক্ষায় সন্তানের সুফল ফলিয়াছিল। বালক বিদ্যাসাগর বালস্বভাব সুলভ চপলতা বশতঃ ঐরূপ অন্যায় কার্য্য করিতেন। কিন্তু যে দিন মাতার সুশিক্ষায় বুঝিতে পারিলেন, ঐ সকল অন্যায় কার্য্য হেতু লোকে নিগ্রহ ভোগ করে, তাহাদের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, সেই দিন হইতেই তিনি ঐরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে অতিশয় অনাশ্রব (একগুঁয়ে) ছিলেন। এজন্য

পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন,এবং তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'ঘাড় কেঁদো'। কিন্তু ভগবতী দেবী হৃদয়ের স্নেহ মমতার দ্বারাই তাঁহাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যেন জানিতেন, প্রগাঢ় সন্তানবাৎসল্যই শিশুকে আপনার হইতে আপনার করিয়া দেয়। তখন এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা তাহার দ্বারা করাইয়া লওয়া যায় না। শিশু যেমন ভালবাসার অধীন, এমন আর কেহই নহে। স্নেহ, মমতা ও বাৎসল্যের শাসনই প্রকৃত শাসন। ভগবতী দেবী বলিতেন, "সন্তান বালকবুদ্ধিবশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে পর, মাতা যদি মুখ আঁধার করিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ বন্ধ রাখেন, আর সন্তান মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া না বেড়ায়, তাহা হইলে, সে মাতাই বা কিরূপ, তাঁহার ভালবাসাই বা কিরূপ, আর তাঁহার মায়ামমতাই বা কিরূপ, কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।" ভগবতী দেবীর এই উক্তি হইতেই পাঠকগণ তাঁহার সন্তানবাৎসল্যের প্রগাঢ়তা অনুভব করিবেন।

সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষ লক্ষণ ছিল। সহানুভূতিই সর্ব্ববিধ উন্নতির নিত্য সহচর এবং দায়িত্বজ্ঞানই মানুষকে সর্ব্বোচ্চ উন্নতিসোপানে উন্নীত করিতে পারে, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি সন্তানগণকে বলিতেন, "আপনি ভাল কাপড় পরার চেয়ে, পরকে পরাইতে পারিলে, অধিক সুখ হয়। নিজে ভাল খাওয়া অপেক্ষা পরকে ভাল খাওয়াইতে পারিলে, অধিক আনন্দ হয়।" এইরূপে তিনি সন্তানগণের হৃদয়ে মনুষ্য জীবনের উচ্চতর ও গভীরতর দায়িত্ব সকল অনুভব করাইয়া দিতেন।

স্বীকার করি মানবের সদ্‌গুণাবলী স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষারূপ ইন্ধন না পাইলে, জ্ঞান ও বিদ্যাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। ক্রিয়ার জলন্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন, অন্য উপায়ে মানুষ মানুষকে শিক্ষা দিতে অসমর্থ। যদি কেহ সম্পূর্ণরূপে আপনাকে বিকাশ করিতে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার শিক্ষা দিবারও ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু বিশুদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা শিক্ষাদানে কেহ কখনই কৃতকার্য্য হন না। যিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ, তিনিই কেবল শিক্ষা দিতে পারদর্শী, এবং গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে, কেহই শিক্ষিত হইতেও পারে না। ছাত্র শিক্ষকের মনোভাব এবং বুদ্ধিবিশ্বাসের সমতলবর্ত্তী না হইলে, শিক্ষার আদান প্রদান কোন মতে সম্ভাবিত নহে। কারণ, শিক্ষাকালে পরস্পরের চিত্তসংযোগ বা বিমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ চিত্তসন্নিপাতের সংঘটন হইলেই, কেবল প্রকৃত শিক্ষা কার্য্যোপযোগিনী হয় এবং প্রতিকূল দৈবপাত বা অসৎ-সংসর্গ হেতু তাহার উপকারিতা কোন কালেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। ভগবতী দেবীর এই সকল শিক্ষাদীক্ষা সকল সন্তানগণই সমান পরিমাণে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের সুফল আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনেই যে অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট দেখিতে পাই, তাহারও কারণ এই। এ সম্বন্ধে অপর দিকে মহাকবি ভবভূতির গভীরভাবপূর্ণ নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমাদের মনে পড়ে :—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।

ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্ যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

গুরু, সুবোধ এবং নির্ব্বোধ দ্বিবিধ ছাত্রকেই সমভাবে বিদ্যা বিতরণ করেন; কিন্তু তদুভয়ের ধারণাশক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারেন না। বিদ্যা-বিষয়ে যে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রই প্রভূত পার্থক্য প্রাপ্ত হন, ইহা বলা বাহুল্য। নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ড কথনই সমর্থ হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষা।

তদানীন্তন কালে পাঠশালায় শিশুদিগের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত। কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এবং যাঁহারা সন্তানদিগকে রাজকার্য্য শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে পারসী পড়াইতেন। যাহারা জমিদারী সরকারে কর্ম্ম করিতে বা বিষয়-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিত, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পাঠাভ্যাসে নিরত থাকিত।

পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটীতে খড়ি দিয়া বর্ণপরিচয় করিত। তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শতকিয়া, কড়ানিয়া, বুড়কিয়া প্রভৃতি লিখিত। শেষে তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত। তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠা-কালী, বিঘাকালী, প্রভৃতি শিখিত। সর্ব্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত। সে সময়ে শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এই ছিল যে, পাঠশালে শিক্ষিত বালকগণ মানসাঙ্ক সম্বন্ধে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইত। মুখে মুখে জটিল অঙ্কের সমাধান করিয়া দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিত।

হস্তাক্ষর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুমহাশয়দিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তৎকালে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রায় ছিল না। যাহাদের হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইত, তাহারা সংস্কৃত পুস্তক হস্তে লিখিত। হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইলে, তাহারা সাধারণের নিকট সম্মানিত হইত। এ কারণ অনেকে হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট করিবার জন্য বিশেষ যত্ন পাইত। তৎকালে এ প্রদেশে বিবাহসম্বন্ধ করিতে আসিলে, লোকে অগ্রে পাত্রের হস্তাক্ষর দেখিত, তৎপরে সম্বন্ধ স্থিরীকরণের ব্যবস্থা করিত।

গুরুমহাশয়গণ বর্ত্তমান স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটী বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে মাসে মাসে তাঁহার সামান্য ১০।১২ টাকা আয় হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্ব্বণ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপরি কিছু কিছু জুটিত, তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পাঠে অমনোযোগী ও দুর্ব্বৃত্ত ছাত্রগণ হাতছড়ি, লাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইত। ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, মিষ্টর উইলিয়ম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা-পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী মন্তব্য প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রায় চতুর্দ্দশ প্রকার দণ্ড বিধান প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় বিদ্যাসাগরের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে বীরসিংহ গ্রামে সনাতন বিশ্বাস পাঠশালার সরকার ছিলেন। সনাতন

ছোট ছোট বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় বিলক্ষণ প্রহার করিতেন, তজ্জন্য শিশুগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া পাঠশালায় যাইতে ইচ্ছা করিত না। একারণ ঠাকুরদাস বীরসিংহ নিবাসী কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক মনোনীত করিলেন। কালীকান্ত, ভঙ্গ কুলীন ছিলেন, সুতরাং বহুবিবাহ করিতে আলস্য করেন নাই। তিনি ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুট গ্রামেই প্রায় অবস্থিতি করিতেন। অপরাপর শ্বশুর ভবনেও টাকা আদায় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। ঠাকুরদাস, তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া, সমভিব্যাহারে করিয়া বীরসিংহে আনিলেন এবং কয়েক দিন পরে পাঠশালা স্থাপন করিয়া দিলেন। কালীকান্ত অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা দিবার বিশেষরূপ প্রণালী জানিতেন এবং তাহাদিগকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন। এ কারণ, ছোট ছোট বালকগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিত। এতদ্ভিন্ন তিনি সকলের সহিত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। স্থানীয় লোকগণ কালীকান্ত চট্টো-পাধ্যায়কে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, এবং সকলেই তাঁহাকে গুরু-মহাশয় বলিত। কালীকান্তের নিকট বিদ্যাসাগর কিঞ্চিদূন তিন বৎসর ক্রমাগত শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সামান্য অঙ্ক কসিতে শিখিলেন। ঐ সময়েই তাঁহার হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কালীকান্ত নানাপ্রকার কৌশল ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি আপন সন্তান অপেক্ষাও বিদ্যাসাগরকে ভালবাসিতেন। গুরুমহাশয় অপরাহ্ণে অপরাপর ছাত্রগণকে অবকাশ দিতেন। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার নিকটে রাখিয়া সন্ধ্যার পর নামতা ও ধারাপাতাদি শিক্ষা দিতেন। অধিক রাত্রি হইলে, প্রত্যহ স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া বাটীতে

আনিয়া বিদ্যাসাগরের পিতামহীর নিকট পৌঁছিয়া দিতেন। গুরুমহাশয় একদিবস সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পুত্র অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, শ্রুতিধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠশালায় যাহা শিখিতে হয়, তৎ সমুদায়ই ইহার শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বরকে এখান হইতে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। আপনি নিকটে রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ ছেলে সামান্য ছেলে নয়, বড় বড় ছেলেদের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছে। আর হস্তাক্ষর যেরূপ হইয়াছে,তাহাতে পুঁথি লিখিতে পারিবে।" বিদ্যাসাগরের কলিকাতায় যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ভগবতী দেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদাস ইং ১৮২৯ ও বাঙ্গালা ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসে গুরু-মহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা, বীরসিংহ হইতে প্রায় ২৬ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে। তৎকালে তথা হইতে কলিকাতায় আসিবার সুগম পথ ছিল না। বিশেষতঃ পথে অত্যন্ত দস্যুর ভয় ছিল। প্রায় মধ্যে মধ্যে অনেকেই দস্যুদিগের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইত। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক আসিতে হইত। ঘাটাল হইয়া রূপনারায়ণ নদী দিয়া, জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতা যাইবার উপায় ছিল বটে, কিন্তু দস্যুভয় প্রযুক্ত নৌকায় যাইতে কেহ সাধ্যমতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং পদব্রজেই আসিতে হইল। বিদ্যাসাগর সমস্ত পথ চলিতে পারিবেন না বলিয়া, ভৃত্য আনন্দরাম গুটিকে ঠাকুরদাস সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন। যখন বিদ্যাসাগর চলিতে অক্ষম হইবেন, তখন মধ্যে মধ্যে এই বাহক, ক্রোড়ে বা স্কন্ধে করিয়া

লইয়া যাইবেক ইহাই তাঁহার মন্তব্য ছিল। প্রথম দিবস বাটী হইতে ৬ ক্রোশ অন্তর পাতুল গ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময়, তথা হইতে ১০ ক্রোশ অন্তর সন্ধিপুর গ্রামে রাজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে আগমন করিলেন। পরদিবস প্রাতে শ্যাখালা গ্রামের প্রান্তভাগে যে বাঁধা রাজপথ শালিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই পথ দিয়া গমনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় পথে মাইল-ষ্টোন দেখিয়া বলিলেন, "বাবা! হলুদ বাটিবার শিল এখানে কেন মাটিতে পোতা রহিয়াছে? আর ইহাতে কি লেখা আছে?" তদুত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, "ইহাকে মাইল-ষ্টোন বলে। ইহাতে ইংরাজী ভাষার নম্বর লেখা আছে। এক মাইল (বাঙ্গালা অর্দ্ধ ক্রোশ) অন্তর এক একটী এইরূপ পাথর পোতা আছে।" শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্য্যন্ত এইরূপ মাইল-ষ্টোনে ইংরাজী অঙ্ক দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী ১ এক সংখ্যা হইতে ১০ পর্য্যন্ত চিনিলেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস মধ্যে জগদীশপুরে যে স্থানে মাইল-ষ্টোন ছিল, সেই স্থান দেখান নাই। ইহার কারণ বিদ্যাসাগর অক্ষর চিনিতে পারিয়াছেন কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে যুক্তি করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ইহার পূর্ব্বে তবে ১টা পাথর আমরা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছি।" তখন কালীকান্ত বলিলেন, "ঈশ্বর, তুমি ইংরাজী সংখ্যা চিনিয়াছ কি না জানিবার জন্য আমরা ঐরূপ করিয়াছি। তুমি যে বলিতে পারিলে, তাহাতে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম।" শ্যাখালা গ্রাম হইতে শালিকার গঙ্গার ঘাট ১০ ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় তথায় সকলে উপস্থিত হইলেন, এবং গঙ্গাপার হইয়া বড়বাজারে বাবু জগদ্দুর্লভ

সিংহের বাটীতে আগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে ঠাকুরদাস, জগদ্দুর্লভ বাবুর এক ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছিলেন; তথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি ইহা ঠিক দিতে পারি।" তাহা শুনিয়া উক্ত সিংহ বলিলেন—"ঈশ্বর, তুমি ইংরাজী অক্ষর কিরূপ করিয়া জানিলে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "কেন, বাবা ও কালীকান্ত খুড়া শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্য্যন্ত পাথরে অঙ্কিত মাইল-ষ্টোন আমাকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতেই ইংরাজী অঙ্কের ১ সংখ্যা হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শিখিয়াছি। সেইজন্য ঠিক দিতে পারিব সাহস করিয়াছি।" উক্ত সিংহ কয়েকটা বিল ঠিক দিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে দিলেন। এই বিলে তাঁহার ঠিক দেওয়া নির্ভুল হইল দেখিয়া, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি চিরজীবী হও। আমি যে আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়া তোমাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা অদ্য আমার সার্থক হইল।" উপস্থিত সকলে বলিলেন, "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার এই বুদ্ধিমান্ পুত্রটীকে ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।" তাহাতে ঠাকুরদাস বলিলেন, "ইহাকে হিন্দু কলেজে পড়িতে দিব মনে মনে স্থির করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলে বলিলেন, "আপনি মাসিক দশটাকা বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দু কলেজে কেমন করিয়া পুত্রকে অধ্যয়ন করাইবেন?" এই কথা শুনিয়া, তিনি উত্তর করিলেন, "ছেলের কলেজের মাসিক বেতন ৫৲ টাকা দিব, আর বাটীর খরচ ৫৲ টাকা পাঠাইব।" ইহার কিছুদিন পরে, জগদ্দুর্লভ বাবুর বাটীর সন্নিহিত বাবু শিবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে যে পাঠশালা ছিল, তথায় রামলোচন

সরকারের নিকট শিক্ষা করিবার জন্য তিনি বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ দুই মাস তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি প্রত্যহ ঠাকুরদাসকে বলিতেন, "বীরসিংহের কালীকান্ত খুড়ার পাঠশালে যেরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পাইয়াছি, তদপেক্ষা ইহার নিকট অতিরিক্ত কিছুই শিক্ষা করিবার আশা নাই।" ইহার কয়েক দিন পরে, বিদ্যাসাগর উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া, সর্ব্বদা অসাবধান অবস্থায় শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায়, ঠাকুরদাসকেই ঐ বিষ্ঠা স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে হইত। এক একদিন এরূপ হইত যে, সিঁড়িতে মলত্যাগ করিলে, সমস্ত সিঁড়িতে তরল মল গড়াইয়া পড়িত। ঠাকুরদাস স্বহস্তে ঐ বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতেন। এই সংবাদ বীরসিংহে প্রেরিত হইলে, ভগবতী দেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় আসিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্বশ্রূ দুর্গা দেবী পৌত্রের এই নিদারুণ পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বেই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে পৌত্রকে দেশে লইয়া গেলেন।

তৎকালে পল্লীগ্রাম হইতে যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় আসিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইতেন। এ পীড়াকে সাধারণতঃ সকলে 'লোনা লাগা' কহিত।

এখন পল্লীগ্রাম হইতে পীড়িত হইয়া লোকে সুস্থ হইবার জন্য কলিকাতা নগরীতে আগমন করে। তখন কলিকাতাতে দুই মাস অবস্থিতি করিলেই, লোকের শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাতা হইতে বাহির হইলে,

তৎপর দিনই শরীর একটু সুস্থ বোধ হইত। সে সময়ে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল, তাহাতে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে। তখন জলের কল ছিল না। প্রত্যেক ভবনে এক একটী কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারিটী পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীগুলি জরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে কয়েকটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দিতেন না। সেইগুলি লোকের পানার্থ ব্যবহৃত হইত। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্ব্বপ্রধান ছিল। উড়িয়া ভারিগণ ঐ জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে দিয়া আসিত। যখন জলের এই প্রকার দুরবস্থা, তখন অপর দিকে সহরের বহিরাকৃতিও অতীব ভীষণ ছিল। এখনকার ফুটপাথের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে জল নির্গমের জন্য এক একটী সুবিস্তীর্ণ পয়ঃপ্রণালী ছিল। কোন কোনও পয়ঃপ্রণালীর পরিসর আট দশ হস্তেরও অধিক ছিল। প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটী শৌচাগার ছিল। সেগুলি দিবারাত্রি অনাবৃত থাকিত। সেইজন্য নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া গমন করা দুরূহ ছিল। মাছি ও মশার উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেই জন্যই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন,—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
দুই নিয়ে কল্‌কেতায় আছি।"

বীরসিংহে ৩।৪ মাস অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাসাগর রোগমুক্ত হইলেন। পুনর্ব্বার জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরদাস দেশে আসিয়া বিদ্যাসাগরকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগরকে

ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ঈশ্বর! এবার বরাবর বাটী হইতে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে পারিবে ত? যদি চলিতে না পার, তাহা হইলে একজন লোক সঙ্গে লইব। সে মধ্যে মধ্যে তোমাকে ক্রোড়ে করিবে।" ভগবতী দেবী ও দুর্গাদেবীও বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন যে, "এবার চলিয়া যাইতে পারিব; সঙ্গে লোক লইবার আবশ্যক নাই।" পরদিন ঠাকুরদাস পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পাতুলগ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের ভবনে অবস্থিতি করিলেন। তৎপর দিবস তথা হইতে তারকেশ্বরের সন্নিহিত রামনগরগ্রামে কনিষ্ঠা পিতৃস্বসার বাটী যাত্রা করিলেন। রাজবলহাটের দোকানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ফলাহার করিলেন। তথা হইতে উঠিবার সময় বিদ্যাসাগর বলিলেন, "বাবা, আমি আর চলিতে পারিব না!" পিতা কতই বুঝাইলেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর বলিলেন, "দেখুন পা ফুলিয়া গিয়াছে, আর পা ফেলিতে পারিব না।" পিতা বলিলেন, "একটু চল, আগে যাইয়া তরমুজ কিনিয়া দিব।" এই বলিয়া ভুলাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই এক পাও চলিলেন না। পিতা বলিলেন, "যদি চলিতে না পারিবে, তবে লোক সঙ্গে লইতে কেন বারণ করিলে?" এই বলিয়া প্রহার করিলেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর রোদন করিতে লাগিলেন। "তবে তুই এখানে থাক্, আমি চলিলাম" এই বলিয়া পিতা কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পুত্র সেই স্থানে বসিয়া আছে, এক পাও চলে নাই। কি করেন, পিতা অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এবার খানিক চল, আগের দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিব।" ঠাকুরদাস অতি খর্ব্বকায়

ও ক্ষীণজীবী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অষ্টম বর্ষীয় বালককে স্কন্ধে করিয়া অধিক দূর গমন করা সহজ ব্যাপার নহে। ঠাকুরদাস তাঁহাকে কখন স্কন্ধে, কখনও ক্রোড়ে করিয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা সন্ধ্যার সময় রামনগরের রামতারক মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগরের পদদ্বয়ের বেদনা লাঘবের জন্য পিতৃস্বসা অন্নপূর্ণা দেবী উষ্ণ তৈল দ্বারা পদদ্বয় মর্দ্দন করিয়া দিলেন। পরদিন পিতাপুত্রে তথায় অবস্থিতি করিলেন। তৎপরদিন বৈদ্যবাটীর পথে আগমন করিলেন, এবং নৌকাযোগে সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে, সহরে উচ্চ শিক্ষা দিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে শিক্ষার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। অথচ মধ্যবিত্ত লোকদিগের অন্তঃকরণে সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। সুবিধা বুঝিয়া কয়েকজন ইংরাজ কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। এই সকল স্কুলে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা অসংলগ্ন ব্যাকরণহীন ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা সমাজে ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।

সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষয় কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। সে সময়ে বাক্যরচনাপ্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিকসংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শুনা যায়, শ্রীরাম-

পুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে প্রশংসাপত্র দিতেন যে, এ ব্যক্তি দুই শত বা তিন শত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে দৈনিক পাঠ সমাপ্ত হইলে, স্কুল বন্ধ হইবার পূর্ব্বে নামতা পড়াইবার ন্যায় ইংরাজী শব্দ পড়ান হইত। যথা—

ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা।
পম্‌কিন্—লাউ কুমড়া, কুকুম্বার—শসা॥

বাক্যহীন ও ব্যাকরণহীন ইংরাজী শব্দের দ্বারা তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। ইংরাজগণও ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বুঝিয়া লইতেন। এবং সেই সকল প্রসঙ্গ সায়াহ্নিক ভোজের সময়ে তাঁহাদের আমোদ প্রমোদের বিশেষ সহায়তা করিত।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাদান করিয়াছেন। কেবল আমাকে দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত বাল্যকাল হইতে সংসার প্রতিপালন জন্য আশু অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইয়াছে। ঈশ্বর সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলে, দেশে টোল করিয়া দিব। জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে অনেক পণ্ডিত বার্ষিক আদায় করিতে আসিতেন। তন্মধ্যে পটোলডাঙ্গাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ৩য় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত ঠাকুরদাসের আলাপ ছিল। তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উপদেশ দিলেন যে, কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে

৫।৬ মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আপাততঃ মাসে মাসে ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইবে। দেশের টোলে পড়িতে দিলে সংক্ষিপ্তসার অধ্যয়ন করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে। কলেজে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, কাব্যের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ তৎকালে পাতুলগ্রামনিবাসী রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃত্তি পাইতেন। ঠাকুরদাস উক্ত বাচস্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও পরামর্শ দেন যে, "ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দাও।"

জগদ্দুর্লভ সিংহের ভগিনী রাইমণি দাসী ও তাঁহার পরিবারগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অতি শিশু দেখিয়া, অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ঠাকুরদাস চাকুরী উপলক্ষ্যে প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত কার্য্যসমাধা করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। পরে পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পিতাপুত্রে ভোজন করিতেন। কর্ম্মস্থল হইতে বাসায় আসিয়া রাত্রি দশটার সময় পুনর্ব্বার পাকাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, ভোজনান্তে উভয়ে নিদ্রা যাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে অষ্টমবর্ষীয় বালক বিদ্যাসাগর প্রায় সমস্ত দিন এই দুই দয়াময়ী মহিলার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বিদেশে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে খাবার দিতেন ও কথাবার্ত্তায় ভুলাইয়া রাখিতেন। বিদ্যাসাগর যখন জননী প্রভৃতির জন্য ভাবনা করিতেন, তখন ঐ রমণীদ্বয় ভুলাইয়া ও কত প্রকার গল্প বলিয়া সান্ত্বনা করিতেন এবং দেশের জন্য বা জননীর জন্য ভাবিতে দিতেন না। উক্ত রাইমণি দাসী ও জগদ্দুর্লভ সিংহের পত্নীর দয়া

দাক্ষিণ্য গুণেই শৈশবকালে বিদ্যাসাগর সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এরূপ দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ না করিলে, বিদ্যাসাগরের কলিকাতায় অবস্থিতি করা দুষ্কর হইত। কারণ তখন সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল, নৈতিক অবস্থাও তদপেক্ষা দূষণীয় ছিল। এস্থলে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি। তখন নাচ, যাত্রা, কবি, হাফআখড়াই, পাঁচালী, বুলবুলের লড়াই প্রভৃতি বিবিধ কৌতুকপ্রদ আমোদ তদানীন্তন বঙ্গসমাজের আচার পদ্ধতির মধ্যে বিধিবদ্ধ ছিল। বুল্‌বুলের লড়াই দেখা ও ঘুড়ী উড়ান সেই সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের এক মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া বেষ্টন করিয়া বহুসংখ্যক বুল্‌বুলি পক্ষী রাখা হইত এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোকের জনতা হইত। ঢাউস ঘুড়ী, মানুষ ঘুড়ী প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল। এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ীর মেলা দেখিতেন।

এতদ্ভিন্ন সেই সময়ে অন্যান্য কৌতুকময় প্রথাও প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজ্‌লিস্ অর্থাৎ গোল্লা বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পক্ষীর সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ পিঞ্জর মধ্যে মনুষ্য পক্ষিস্বরূপ অবস্থিতি করিত। আমোদ ক্ষেত্রে সেই সকল পিঞ্জর আনীত হইলে, কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক, এইরূপ নানাবিধ পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইত, এবং মধ্যে মধ্যে পক্ষীর অব্যক্তস্বরে গান করিত।

জননীর স্নেহ ও ভালবাসা হইতে দূরে থাকিয়া এই সকল নীচ আমোদ-প্রিয় পুরুষ দলবেষ্টিত সহরে আসিয়া বাস করিতে হইলে, সিংহ পরিবারের ন্যায় পরিবার মধ্যে আশ্রয় লাভ করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে হইবে। সিংহ পরিবারের স্নেহ ও ভালবাসা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কি মহা ইষ্ট সাধন করিয়াছিল, তাহা বাক্যে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। উত্তরকালে যাঁহারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্নেহ পাইয়া মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। এই সিংহ পরিবারের রাইমণি প্রবাসে বিদ্যাসাগরের মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপম স্নেহ ও যত্নের দ্বারা তিনি কি পরিমাণে বিদ্যাসাগরের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনচরিতে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উর্দ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম :—

"তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদগুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াশীলা সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয় মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে

করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" শুনা যায়, মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনও বাল্যকালে নারীজাতির স্নেহ মমতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে নারীজাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর কলিকাতায় আগমন করিলে, প্রথমতঃ পুত্রবৎসলা জননী ভগবতী দেবী পুত্রের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে দিনযাপন করিতেন। এবং অবিরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিতেন। পরিশেষে যেদিন শুনিলেন, রাইমণির দয়াদাক্ষিণ্যে বিদ্যাসাগর প্রবাসে পরিপুষ্ট হইতেছেন, সেই দিন হইতে তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই গৃহের অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায়, রাইমণির ও তাঁহার পুত্রের মঙ্গল কামনা তাঁহার নিত্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮২৯ সালের জুন মাসের প্রথম দিবসেই ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরকে কলিকাতাস্থ পটোলডাঙ্গা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৩য় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এই দিন বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গলার ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। এই দিনের মাহাত্ম্য এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। যে সুললিত দেবভাষা সংস্কৃতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সাহসী হন নাই

এবং যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে যে, আজ বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গভাষা সেই সুললিত দেবভাষা সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছে। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার জননী সংস্কৃতভাষার সেবার নিমিত্ত সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিরাট্ মহাপুরুষ ব্যতীত কে মাতৃভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন? তিনি সযত্নে ও পরিশ্রমে যে মাতৃভাষাতরু রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতী সন্তানগণ যত্নসহকারে প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়াছেন বলিয়াই আজ আমরা মাতৃভাষাতরুকে ফলপুষ্পে সুশোভিত মহীরুহ-রূপে অনুধ্যান করিতে পারিতেছি।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে পরিগৃহীত হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। আমার অপেক্ষা ক্লাসে আর কেহ উৎকৃষ্ট শিক্ষা করিতে না পারে, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে ঈশ্বরচন্দ্র চিরকাল আন্তরিক যত্ন পাইয়াছিলেন। এমন কি শৈশবকালে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। প্রায়ই পিতাকে বলিতেন, "রাত্রি দশটার সময় আহার করিয়া শয়ন করিব, আপনি রাত্রি ১২টা বাজিলে আমায় তুলিয়া দিবেন, নচেৎ আমার পাঠাভ্যাস হইবে না।" পিতা আহারের পর দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। নিকটে আরমাণি গির্জ্জার ঘণ্টারব শুনিয়া, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিতেন। পরে তিনি উঠিয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করি-

তেন। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। যেমন তিনি পাঠে অনুরক্ত ছিলেন, সেইরূপ শিক্ষকগণের প্রতি ভক্তিমান্ ও সমপাঠীদিগের সহিত প্রীতির বন্ধনেও আবদ্ধ ছিলেন। লোকে মনে করিয়া থাকে, লিখিয়া পড়িয়া কৃতী ও কার্য্যক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা। কিন্তু গুরু শিষ্যের ভক্তির সম্বন্ধ, বালকে বালকে সখ্যভাব যে শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ—তাহা অনেকে জানেন না। সেইজন্য বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানুষ প্রস্তুত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

নয় বৎসর বয়সের সময় সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ২২ বৎসরের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের পাঠ্য সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার অনুজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সন্তানগণের পঠদ্দশায় ভগবতী দেবী চরকায় সূতা কাটিয়া পুত্রগণের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। ভ্রাতৃগণ সেই মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া অধ্যয়নার্থ পটোলডাঙ্গায় কলেজে গমন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আজীবন মোটাবস্ত্র পরিধান করিতে দেখা গিয়াছে। তিনি কখন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন নাই।

Forwarded by order of
the Director of Public
Instruction, Bengal.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পারিবারিক জীবন।

পারিবারিক বন্ধন মানবজাতির অশেষ কল্যাণ ও সুখের নিদান-স্বরূপ। পারিবারিক সম্বন্ধই মানবজীবন ও পশুজীবনে প্রভেদের পরিচায়ক, এবং পারিবারিক দায়িত্বজ্ঞান বা দায়িত্বহীনতাই, মানব-চরিত্রকে দেবভাবে সম্বর্দ্ধিত বা পশুভাবে পরিণত করে। ইহসংসারে যিনি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার চরিত্রপরীক্ষার উপযুক্ত স্থল কোথায় ? ইহ সংসারে যাঁহাকে আপনার বলিতে কেহই নাই, এই সুখময় ভূমণ্ডল তাঁহার নিকট যে দুঃখময় জীর্ণ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? মানবের পরিজনবেষ্টিত সংসার সত্য সত্যই তদীয় সুখ ও সদ্গতির লীলাভূমিস্বরূপ। পারিবারিক বন্ধনই মনুষ্যহৃদয়ে প্রকৃত বল ও শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে, এবং পরিবারস্থ সকলের পরিচর্য্যা দ্বারাই মানবচরিত্রের উৎকর্ষলাভ ঘটে।

হৃদয়ের উদারতাই মানবের সভ্যতার পরিচায়ক। সেইরূপ, যেখানে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা, সেইখানেই অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার আধিপত্য। মানুষ যতদিন এই অজ্ঞানান্ধকারে থাকে, ততদিন তাহার চারিধারের এই বহুর মধ্যে সে সেই এককে দেখিতে পায় না। মানব-সমাজের এই অসঙ্খ্য খণ্ডতার মধ্যে চিরদিন যে মহতী একতা বিরাজ

করিতেছে, তাহা উপলব্ধি ও অনুভব করিতে সে অসমর্থ। সেইজন্য, আপনার মোহবশে সে তাহার চতুর্দ্দিকের এই বৃহৎ জগতকে, এই বিপুল মানব সমাজকে সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র করিয়া তাহার আপন ধারণার ও হৃদয়ের উপযুক্ত করিয়া লয়। কিন্তু, ক্রমে তাহার জ্ঞান যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠে, প্রাণ যতই প্রসারিত হইতে থাকে, ততই সে তাহার সেই ক্ষুদ্র জগতের সীমার গণ্ডীকে বিস্তৃত ও বৃহৎ করিয়া তুলে। এই ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশই সংসারের নিয়ম। এই নিয়মের বশে মনুষ্যহৃদয় তাহার আপন ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, ক্রমে পরিবারের, তাহার পর গ্রামের, তাহার প্রদেশের, তাহার পর দেশের ও অবশেষে জগতের সকলেরই মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার চতুর্দ্দিকের এই অসঙ্খ্য দেশকে সে একই পৃথিবী বলিয়া উপলব্ধি করে, এবং বহুবর্ণে, ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে পৃথগ্‌ভূত এই অগণ্য মানবসমাজকে তাহার আপন সমাজ বলিয়া সে স্বীকার করে। তখন এই পৃথিবীর সকল দেশই তাহার স্বদেশ, সকল জাতিই তাহার স্বজাতি। এই উদারতা, এই সভ্যতাই উন্নতির চরম আদর্শ।

মহাজনগণের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক, দিব্যজ্ঞানালোকে যাঁহাদিগের চক্ষু জ্যোতিষ্মান্, বসুধাকে যাঁহারা আপনার বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা 'অয়ং নিজঃ পরোবেতি' গণনা বিস্মৃত হইয়া, সাধনার বলে ধৃতি, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা চরিত্রগত করিয়াছেন, ইহ সংসারে শোণিতসম্পর্কবিচার তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। কারণ, তাঁহারা স্বজাতি বা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসিবৃন্দকে এক পরিবারস্থ মনে করিয়া, তাঁহাদেরই পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু

জগতে সেরূপ রমণীরত্ন, বা সেরূপ মহাপুরুষ অতি তুর্লভ সেবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পারিবারিক বন্ধন মনুষ্যহৃদয়ে সুখ, শান্তি ও পবিত্রতা বিস্তার করে। গুরু লঘু ভেদে পরিবারস্থ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি ও পরিচর্য্যার বিনিময়ই ইহার কারণ। জনক জননী যদি নিঃস্বার্থ প্রীতিবশতঃ সন্তানের হিতকামনা না করিতেন, সন্তান যদি স্বাভাবিক ভক্তিবশে পিতামাতার সেবা না করিত, পতি যদি প্রণয়ের অনুরোধে পত্নীর সুখ সাধনে যত্নবান্ না হইতেন, এবং পত্নী যদি পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে পতির সুখ দুঃখের অংশভাগিনী না হইতেন, তাহা হইলে এই সংসার মরীচিকাসঙ্কুল মরুভূমি বা ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি হইতেও যে ভীষণতর হইত, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? সুখদুঃখের অংশভাগী কাহাকেও যদি মানুষ ইহ সংসারে না পায়, তাহা হইলে সে জীবিত থাকিতে পারে না। কেহ কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে, তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিবার অথবা তাহার দুঃখ উপশম করিবার জন্য ইহ সংসারে যদি তাহার কেহ না থাকে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় যে দুঃখভারে অবনত ও ভগ্ন হইয়া পড়িবে, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। সেইরূপ কোন ব্যক্তি অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, যদি তাহার মুখের দিকে প্রসন্নভাবে দৃষ্টিপাত করিবার তাহার কেহ না থাকে, তাহার উৎসাহ ও তৃপ্তির অংশভাগী হয়, এরূপ কোন প্রিয়জন সে ইহ-সংসারে অন্বেষণ করিয়া না পায়, তাহা হইলে সৎকার্য্য ও সাধনায় তাহার অনুরাগ কোন ক্রমেই অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

ইহ সংসারে নারীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতি করুণাময় পরমেশ্বরের দুই

বিচিত্র সৃষ্টি। এই উভয় প্রকৃতিই অনুপম সৌন্দর্য্যের আধার। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ,—নারীদেহ সুকোমল ও লাবণ্যে পরিপূর্ণ। পুরুষ প্রকৃতি শৌর্য্য, বীর্য্য, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের আধার—আর নারীপ্রকৃতি স্নেহ, মমতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। বিধাতার এমনই সৃষ্টিকৌশল যে, পাছে, ঐ প্রকৃতিদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায়ের পরিপন্থিরূপে যাবতীয় সৃষ্টিক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, এইজন্য তিনি উহাদিগকে পরস্পরসাপেক্ষ করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ পর্ব্বতগাত্রনিঃসৃত দুইটী জলস্রোত সমতল ভূমিতে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় এবং সেই একীভূত জল-স্রোত শক্তি ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে করিতে অনন্ত সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ রমণী ও পুরুষ ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত পালিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়, এবং শুভ-পরিণয় যোগে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া অনন্ত উন্নতি ও সাধনার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহারই নাম স্বাভাবিক প্রেম। এই স্বাভাবিক প্রেমমুগ্ধ দুই অভিন্ন হৃদয়ের যে পরস্পর উদ্বাহ বন্ধন, তাহাই প্রকৃত পবিত্র পরিণয়। এই শুভ-পরিণয় প্রথাই পরিবারগঠনের মূল এবং মানবের সংসারবন্ধনের সেতুস্বরূপ।

কর্ত্তব্যসাধনেই মানুষের মনুষ্যত্ব। হিতাহিত বিচার কর্ত্তব্যজ্ঞানের মূলেই নিহিত রহিয়াছে। পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইলে, মানুষের দাম্পত্যকর্ত্তব্য এবং অপত্যাদির প্রতি কর্ত্তব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রতিবেশীর সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও পৌরজন মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মানব জাতিতে জন্ম হেতু, আর আত্মকর্ম্ম ও অবস্থা বশতই মানুষকে কতকগুলি কর্ত্তব্যসাধন করিতে

বাধ্য হইতে হয়। এইরূপে চিন্তা করিলে, মানুষের কর্ত্তব্যের অসীম পরিসর দেখিতে পাওয়া যায়। পিতামাতার প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি পিতামাতার, পতির প্রতি পত্নীর, পত্নীর প্রতি পতির, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি ভ্রাতাভগিনীর, আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি আত্মীয় কুটুম্বের, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর, স্বদেশবাসীর প্রতি স্বদেশবাসীর এবং প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এই সকল কর্ত্তব্যের কোন একটী সাধিত না হইলেই, মানুষকে অপরাধী হইতে হয়।

জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে মানুষের কর্ত্তব্যের পরিসর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য বুদ্ধিমান ও পারদর্শী সন্তানের যত অধিক, নির্ব্বোধ বা অল্পবয়স্ক সন্তানের তত নহে। যিনি যে পরিমাণে বিধাতার প্রদত্ত সম্পদ লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি ? কর্ত্তব্য-সাধনেই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা। কর্ত্তব্য যাঁহার নিকট দুর্ব্বহ নহে, কর্ত্তব্য-কার্য্যসম্পাদন, তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় যাঁহার নিকট ক্লেশকর নহে, বালকের ব্যায়ামের ন্যায় কর্ত্তব্য যাঁহার নিকট মঙ্গলকর ও সুখপ্রদ, তিনিই প্রকৃত নিষ্কামধর্ম্মের অধিকারী এবং সাধুপদবাচ্য।

১২৪৮ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, এখন আমি মাসে ৫০৲ টাকা বেতন পাইতেছি, ইহার দ্বারা স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে। আপনি এ পর্য্যন্ত আমাদের জন্য বিস্তর কষ্ট

সহ্য করিয়াছেন এবং অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনাকে আর শরীরপাত করিতে দিব না। আপনি দেশে গিয়া অবস্থিতি করুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিরতিশয় নির্ব্বন্ধে বাধ্য হইয়া ঠাকুরদাস কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরসিংহে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর প্রতি মাসে তাঁহাকে ২০৲ টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং আপনার বাসা খরচের নিমিত্ত ৩০৲ টাকা রাখিতেন।

ঠাকুরদাস কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর মাতা দুর্গাদেবী উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধূর উপর সংসারের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া প্রশান্তমনে ভগবচ্চিন্তায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংসারের জন্য অর্থব্যয়ের ভার পিতার উপর এবং পবিবারে গৃহিণীপনার ভার জননীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। মাতা-পিতাও উপযুক্ত পুত্রের অনভিমত কোন কর্ম্ম প্রাণান্তেও করিতেন না। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ দায়িত্ব জ্ঞান ছিল বলিয়াই ঐ একান্নবর্ত্তী পরিবারের গার্হস্থ্য ধর্ম্মসাধনে কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই।

ন্যায়পরতা পারিবারিক শান্তি ও উন্নতির প্রতিভূ-স্বরূপ। একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে বাস করিতে হইলেই প্রবল ও দুর্ব্বল, স্বার্থপর ও পরার্থপরায়ণ, কোপন এবং ক্ষমাশীল, এবম্বিধ বিবিধ প্রকার অবস্থা ও চরিত্রশালী বহু লোককে একত্র অবস্থিতি করিতে হয়। ন্যায়জ্ঞান যদি মানুষের স্বাভাবিক না হইত, ন্যায়ান্যায় বিচার দ্বারা যদি পরিবার পরিচালিত না হইত, তাহা হইলে অত্যাচার, অপচয় এবং বাদ বিসংবাদে উহা উৎসন্ন হইয়া যাইত। একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে সর্ব্বদা যে সকল অসুবিধা সংঘটনের সম্ভাবনা, ঠাকুরদাসের গৃহে সেরূপ অসুবিধার অভাব

ছিল না। কিন্তু তাঁহার ন্যায়দণ্ডের তুলাবিধানে সে সকল অসুবিধা ও অভিযোগ জলবিম্ববৎ উৎপত্তি মাত্রই লয় প্রাপ্ত হইত। এইরূপে ঠাকুরদাস গৃহকর্তৃরূপে স্বীয় পরিবারের এবং অভিভাবকরূপে প্রতিবেশিগণের তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভগবতী দেবী গৃহিণীরূপে গৃহের ও হিতৈষিণীরূপে প্রতিবেশিগণের সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত নিরত হইলেন এবং তাঁহার পারিবারিক জীবনেরও সূচনা হইল।

বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সুখ ও মঙ্গল সাধনের জন্যই মানুষ সংসারযাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু মানুষের আত্মকর্ম্মফলে সেই সুখ ও মঙ্গল লাভের কতকগুলি অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। আলস্য পারিবারিক সুখ নাশের এক প্রধান হেতু। আলস্য দারিদ্র্যের মূলীভূত কারণ এবং চরিত্র-শিথিলতার নিত্যসহচর। দারিদ্র্য নানা দুঃখের জন্মদাতা, মনুষ্যের মনুষ্যত্বনাশক, এবং জনসমাজের শক্তি ও পবিত্রতার মূলোৎপাটক। এই গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ আলস্য। আলস্য কেবল দরিদ্রতারই উৎপাদক নহে। সংসারের মধ্যে এক ব্যক্তি অলস হইলে, তাহাকে অপর ব্যক্তির গলগ্রহ হইতে হয়, অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে তাহার করণীয় পরিশ্রমের ভার বহন করিতে হয়। ইহাতেও বহুস্থলে মনোভঙ্গ হইয়া থাকে।

অক্ষমা পারিবারিক শান্তিভঙ্গের অন্য এক প্রধান কারণ। পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া, যে কতকগুলি লোক এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। একপরিবারস্থ জনগণের পদেপদে পরস্পরের ইচ্ছা, রুচি ও স্বচ্ছন্দতার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে মনোভঙ্গের কারণ না ঘটে, তদ্বিষয়ে

যেমন সাবধান হওয়া আবশ্যক, তেমনই আবার ক্ষমাশীল হইতে যত্ন করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উগ্রস্বভাবই অসহিষ্ণুতার কারণ। ক্ষমাশীল লোক পারিবারিক বন্ধনের অটল স্তম্ভ। ক্ষমাশীল লোকদ্বারা যে পরিবার গঠিত হয়, তাহা সংসার সুখের দুর্গস্বরূপ।

পারিবারিক সুখের আর এক অন্তরায় আতিশয্য। কোন বিষয়েই আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নহে। সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রাকৃতিক নিয়মের এক প্রধান লক্ষণ। মানুষের হৃদয়মনের কোন বৃত্তি বা ভাব অস্বাভাবিক রূপে আতিশয্য লাভ করিলে, মানবজীবন বিকৃত এবং অক্ষম হইয়া পড়ে। সমঞ্জসীভূত উন্নতি সাধনেই মনুষ্য জীবনের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতা অবস্থিতি করে। কোন বিষয়ে আতিশয্য হইলেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। আত্মরক্ষার্থে এবং আত্মজনের হিতার্থে অর্থসঞ্চয় করা যেমন মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তেমনিই আবার দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষসাধন ও সমাজের হিতসাধন করিবার জন্য, দান এবং পরোপকার করাও মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সঞ্চয় বা দান, ইহার কোন বিষয়েই আতিশয্য প্রার্থনীয় নহে। সঞ্চয়ে আতিশয্য অবলম্বন করিলে, মানুষ কার্পণ্য অবলম্বন করিয়া কেবল যে দান বা পরোপকারেই নিবৃত্ত থাকে, তাহা নহে, আত্মহিত এবং আত্মজনের প্রয়োজন সাধনার্থে ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই উপলব্ধি করিতে পারে, উহার অন্যান্য গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কৃপণ ব্যক্তিও সেইরূপ সংসারের ভার বহন করে এবং ঐ ভার মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে—পারিবারিক জীবনের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে

অসমর্থ।* এইজন্য কবি অমরভাষায় সমৃদ্ধিশালী কৃপণ ব্যক্তিদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—"তুমি ধনী হইলেও দরিদ্র। গর্দ্দভ উহার নিপীড়িত পৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত স্বর্ণরাশির ভার বহন করে, তুমিও সেইরূপ ধনের ভার মাত্র বহন করিয়া পথে একটুকু অগ্রসর হইতেছ, এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমায় সেই ভার হইতে বিমুক্ত করিতেছে।† ব্যয়কুণ্ঠতা যেমন একদিকে অন্যায়, সেইরূপ অপরদিকে দান বা পরোপকারে আতিশয্য অবলম্বন করিলেও মানুষ অপব্যয়ী এবং অপরিণামদর্শী হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে, এবং পরিণামে বিপৎকালে আত্মরক্ষা বা আত্মজনের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যও করিয়া উঠিতে পারে না। কার্পণ্য এবং অমিতব্যয়িতা হইতে দূরে থাকিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃত জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য।

পারিবারিক সুখের আর এক অন্তরায়, পারিবারিক জীবনে শ্রদ্ধার অভাব। শাস্ত্রে আছে ঃ—"ক্ষুধাতে প্রজ্ঞা নষ্ট করে, ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। যাহার জ্ঞান ক্ষুধাতে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধৈর্য্যও থাকে না। যে বুভুক্ষাকে জয় করে, সে নিশ্চিত স্বর্গ জয় করে। যেখানে দান প্রবৃত্তি থাকে, সেখানে ধর্ম্ম কখন অবসন্ন হয় না। মনুষ্যের দ্রব্যার্জ্জন সূক্ষ্ম ব্যাপার। উপযুক্ত পাত্রে দান করা, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। উপযুক্ত

---

* যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।

† "If thou art rich, thou art poor;
For like an ass, whose back with ingots bows,
Thou bearest thy heavy riches but a journey,
And Death unloads thee."—*Shakespeare.*

কালে দীন, তাহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শ্রদ্ধাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বর্গদ্বার, অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্য মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পায় না। লোভবীজ তাহার অর্গলস্বরূপ। ক্রোধকর্তৃক তাহা রক্ষিত। অতএব তাহা অতি দুরাসদ। যে পুরুষেরা জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, যোগযুক্ত, তপস্বী, ব্রাহ্মণ, এবং যাঁহারা যথাশক্তি দান করেন, তাঁহারাই তাহা দেখিতে পান। যাঁহার শক্তি সহস্র পরিমিত, তিনি শত দান করিলে যে ফল হয়, যাঁহার শক্তি শত পরিমিত, তিনি দশদান করিলেই সেই ফল হয়। শক্তি অনুসারে কেবল জলদান করিলেও সেই ফল হয়। মহামূল্যদানে ধর্ম্ম প্রীত হন না, ন্যায়লব্ধ সামান্য বস্তু শ্রদ্ধাপূতচিত্তে দান করিলে সন্তুষ্ট হন। ঐশ্বর্য্য মনুষ্যের পুণ্যের কারণ নহে। সজ্জনগণ আপনার শক্তিতে যাহা সদুপায়ে উপার্জ্জন করেন, বিবিধ যজ্ঞ, সেই ন্যায়লব্ধ ধনের তুল্য পুণ্যের কারণ নহে। ক্রোধ দান ফল নষ্ট করে। লোভ থাকিলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। ন্যায়বৃত্তি দ্বারাই দানবিৎ স্বর্গপ্রাপ্ত হন। রন্তিদেব নামে রাজা দরিদ্রাবস্থায় শুদ্ধচিত্তে কেবল একটু জলদান করিয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। নৃগ রাজা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গো দান করিয়াও একটী পরকীয় গো দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নরকগমন হইয়াছিল। উশীনর পুত্র শিবিরাজা আত্মমাংস দান করিয়া পুণ্যবান্‌গণের প্রাপ্য যে লোক তাহা লাভ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছেন। * ফলতঃ পারিবারিক জীবনের সমস্ত বিষয়ই শ্রদ্ধাপূতচিত্তে সুসম্পন্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পারিবারিক সুখের প্রধান অন্তরায় মানবের ধর্ম্মহীনতা। ধর্ম্মভাব

* মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

ও ধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন পরিবার বর্ত্তমান ও ভাবী দুর্গতির উৎপত্তি স্থান। যাঁহারা ঈশ্বরের অযাচিত স্নেহের প্রতিনিধিজ্ঞানে জনকজননীকে ভক্তি করেন, যাঁহারা পতিপত্নীতে প্রাণের বিনিময় করিয়া, সম্মিলিতহৃদয়ে ঈশ্বরদত্ত সংসার সম্ভোগ করেন, যাঁহারা ঈশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তান প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই যথার্থ পরিবার প্রতিপালন করেন। পরিবারসাধন তাঁহাদিগেরই পক্ষে তৃপ্তি ও সদ্গতির হেতু হইয়া থাকে। যাঁহারা পারিবারিক ক্ষুদ্র মহৎ প্রত্যেক ব্যাপার ঈশ্বরের অযাচিত করুণার অভিনয়রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, পরিবার তাঁহাদিগের নিকট স্বর্গসুখের প্রতিকৃতিস্বরূপ, পারিবারিক উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের পরিশ্রম, পুণ্যতীর্থের পথপর্য্যটনস্বরূপ, এবং তাঁহাদের পারিবারিক প্রত্যেক কার্য্য স্বর্গরাজ্যের সোপানস্বরূপ হইয়া থাকে।

ঠাকুরদাসের ঔরসে ও ভগবতী দেবীর গর্ভে সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রগণের নাম, ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও ভূতনাথ। তিন কন্যার নাম,—মনোমোহিনী, দিগম্বরী ও মন্দাকিনী। আমরা যে সময়ের প্রসঙ্গ বলিতেছি, তখন ঈশ্বরচন্দ্র ও দীনবন্ধুর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও পরিবারভুক্ত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন লইয়া ভগবতী দেবীর এক বৃহৎ সংসার। সংসারই মানুষের প্রকৃত পরীক্ষার স্থল। সংসাররূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে ভগবতী দেবী কি ভাবে ও কি পরিমাণে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাবলী পাঠে পাঠকগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলস্য পারিবারিক সুখের এক অন্তরায়।

আলস্য ও জড়তা যাহাতে পরিবার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, তৎপ্রতি ভগবতী দেবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি পরিবারস্থ প্রত্যেকের কতকগুলি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেককেই সেই সকল কার্য্য প্রত্যহ সুসম্পন্ন করিতে হইত। এইরূপে একের করণীয় পরিশ্রমের ভার অপরকে বহন করিতে হইত না। সুতরাং পরিবার মধ্যে এ সম্বন্ধে মনোভঙ্গেরও কোন কারণ উপস্থিত হইত না। এই সকল পারিবারিক বিধি যাহাতে পরিবারস্থ সকলে ক্লেশকর মনে না করে, সেইজন্য তিনি স্বয়ং প্রাতঃকাল হইতে রজনীর প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর গৃহ এবং গৃহের যাবতীয় পদার্থের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি মনোনিবেশ করিতেন। দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী, সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, এইজন্য তিনি অতি সামান্য দ্রব্যও সযত্নে রক্ষা করিতেন। গৃহসামগ্রী সকল বিশৃঙ্খল করিয়া রাখা, সম্পত্তি রক্ষা ও সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল। গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরই ধনক্ষয় হয়, এইজন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে গৃহের যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন।. এই সকল কার্য্যে তিনি গৃহের শিশু সন্তান-দিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তিনি গৃহের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন, "আমি যদি গৃহে না থাকি, আর কেহ কোন দ্রব্য লইতে আইসে তাহা হইলে, 'নাই' কথা কখন মুখে আনিও না। আমি যে পরিমাণে দিই, সে পরিমাণে না দিলেও, কিছু দিবে। শুধু হাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে না।" তিনি প্রত্যহ স্বয়ং রন্ধন করিতেন এবং পরিবারস্থ

সকলকে সমভাবে পরিবেশন করিতেন। এ সম্বন্ধে কেহ কখন তাঁহার পার্থক্য দৃষ্টিগোচর করে নাই। পরিবারস্থ সকলের আহারাদি সুসম্পন্ন হইতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। তৎপরে কোন অতিথি সমাগত হয় কি না দেখিবার জন্য তিনি দুই এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেন। ইহার মধ্যে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, মুখের অন্নে অভ্যাগতের পরিচর্য্যা করিতেন। শেষে হয় ত স্বয়ং উপবাস কিম্বা সামান্য জলযোগ করিয়া সমস্ত দিন যাপন করিতেন। তিনি যে কেবল আপনার সংসার লইয়াই দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকিতেন এরূপ নহে। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ হয়ত পীড়িত হইয়াছে, পথ্যাদি রন্ধন করিয়া দিবার লোক নাই, এই সকল তাঁহার কর্ণগোচর হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহ হইতে পথ্যাদি রন্ধন করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহাকে দিয়া আসিতেন। নিরন্তর তিনি কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দ্বিপ্রহর রজনীতে ভোজনান্তে যখন সকলে বিশ্রাম সুখ লাভ করিত, তখনও তিনি একাকিনী বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেন। এইরূপে সংসারকে তিনি এক প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন এবং হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি সমূহ যাহাতে পরিবারস্থ জনগণকে আক্রমণ করিতে না পারে, তিনি তাহার প্রকৃষ্ট উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, "তুমি নিজের মন্দ না করিয়া কখন পরের অপকার করিতে পার না। অপরকে লঘু মনে করিতে গিয়া নিজেই লঘু হইয়া যাইবে। অপরের সহৃদয়তা গ্রহণ করিতে বিমুখ হইলে, তুমিও শীঘ্র হৃদয়শূন্য হইবে। তুমি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কে তোমার অপকার করিতে পারে? তোমার যাহা অমঙ্গল

ঘটে, তুমি নিজে তাহা দিবারাত্রি সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া থাক; এবং নিজের দোষ ব্যতীত কখনই সত্য সত্য ক্লেশভোগী হও না। সুতরাং অপরের যাহা গুণ তাহাই দেখিবে ও আলোচনা করিবে। দোষের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। অন্যের প্রতি হিংসা, দ্বেষ প্রকাশ করিবে না। অন্যের ভাল দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করিবে।"

ফলতঃ সমাজে থাকিয়া ন্যায় ও প্রীতির বন্ধন ছেদন করিতে গেলেই শীঘ্র শাস্তিভোগ করিতে হয়। ভয় ও আশঙ্কা নানাদিকে উদিত হইয়া তাহার শাস্তি বিধান করে। যতদিন সহচর মানবগণের সহিত স্বভাবের সরল বন্ধনে আবদ্ধ থাকি, ততদিন তাহাদিগকে দেখিয়া কোন বিরক্তি জন্মে না। তখন পরস্পর মিলনে সরিৎ সঙ্গম বা দুই বায়ু প্রবাহের ন্যায় মিশিয়া এক হইয়া যাই। কিন্তু ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুটিল পথ অবলম্বন করিলে, অথবা 'আমার ভাল, তাহার নয়' ইত্যাকার স্বার্থানুকূল কর্ম্মের চেষ্টা করিবামাত্র প্রতিবেশী অন্যায় বুঝিতে পারে। আমি তাহার প্রতি যতদূর সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছি, সেও আমার প্রতি ততদূর সঙ্কোচ প্রকাশ করে। তাহার চক্ষু আর আমার চক্ষুকে অন্বেষণ করে না। বিরোধ উভয়ের অন্তরে উদিত হয় এবং তাহার মনে ঘৃণা ও আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে থাকে। সুতরাং আমার কার্য্যের জন্য আমিই একমাত্র দায়ী। ক্রিয়া মাত্রেরই দণ্ড ও পুরস্কার স্বতঃই বিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অপরাধের স্বভাবসহচর। অপরাধ ও দণ্ড এক বৃক্ষ হইতেই সমুৎপন্ন। দণ্ডরূপ ফল, প্রমোদ কুসুমের স্নিগ্ধ ও সুরভি অভ্যন্তরেই অজ্ঞাতসারে পরিপক্বতা লাভ করে। হেতু ও পরিণাম, উপায় ও উদ্দেশ্য, বীজ ও ফল, স্বভাবতঃ যুগ্ম সামগ্রী; তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা মনুষ্যের

সাধ্য নহে।০ কারণ পরিণাম হেতুর অভ্যন্তরেই প্রস্ফুটিত ও উদ্দেশ্য উপায় মধ্যেই প্রাগ্বর্ত্তমান এবং বীজের অভ্যন্তরেই ফল স্বভাবতঃ সন্নিহিত।

শ্বশ্রূ দুর্গাদেবী যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন ভগবতী দেবী সাংসারিক অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এক সময়ে দুর্গাদেবী ভগবতী দেবীকে বলিয়াছিলেন, "মা, এখন সন্তানের মা হইয়াছ, গৃহিণী হইয়াছ, এখনও কি সমস্ত বিষয়ে আমার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হইবে? তদুত্তরে ভগবতী দেবী বিনীত ভাবে বলিলেন, "মা বাপের নিকট সন্তান চিরকালই শিক্ষা করিবে। বাল্যকালেই মাতুলালয় হইতে এখানে আসিয়াছি। আপনিই লালন পালন করিয়াছেন, নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। সংসারে আমার মা বলিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই। সাংসারিক বিষয়ে আমার অপেক্ষা আপনার জ্ঞান অনেক অধিক। যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন, ততদিন সকল বিষয়ে আপনার পরামর্শ লইয়াই কার্য্য করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া দুর্গাদেবী আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভগবতী দেবী দুর্গাদেবীকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, দুর্গাদেবী পরলোক গমন করিলে, ভগবতী দেবী এরূপ শোকাকুল হইয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া মাতৃহীন শিশুর ন্যায় বিলাপ ও রোদন করিতেন।

পরিবারস্থ জনগণ পদে পদে পরস্পরের ইচ্ছা, রুচি ও স্বচ্ছন্দতার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে মনোভঙ্গের কারণ না ঘটে, তদ্বিষয়ে যেমন সাবধান হওয়া আবশ্যক, তেমনই আবার ক্ষমাশীল হইতে যত্ন করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উগ্র স্বভাবই অসহিষ্ণুতার কারণ।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন ফুৎকারে প্রজ্বলিত হইয়া গ্রাম ও নগর দগ্ধ করে,সেইরূপ সামান্য কারণেও ক্রোধোদয় হইয়া, পৃথিবীতে তদপেক্ষা গুরুতর বিভ্রাটই ঘটিয়া থাকে। উগ্রতা বশতঃ মুহূর্ত্ত মধ্যে যে ক্ষতি হইতে পারে, চির-জীবনে তাহার প্রতিকার হয় না। কোন কোন লোক এমন অসহিষ্ণু যে, পরিবার মধ্যে বিসম্বাদ ঘটাইয়া পরের নিকট গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিয়া দেয়। অত্যধিক উগ্রতাই তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া ফেলে। কিন্তু কালক্রমে পরের দ্বারা নিন্দিত ও নিগৃহীত হইয়া, তাহার এই অপরিণাম-দর্শিতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে। পরিবারস্থ সকলে যাহাতে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হয়, ভগবতী দেবী সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করিতেন। কন্যা-গণ কোন নবীনা বধূর কোন ত্রুটি উল্লেখ বা তাহার উপর দোষারোপ করিলে ভগবতী দেবী বলিতেন, "সংসারের সামান্য বিষয়ে এরূপ দৃষ্টি কেন? আহা! ছোট ছোট বৌগুলি মা বাপের কোল হইতে আমার কাছে আসিয়াছে। আমি যদি উহাদের মুখের দিকে না চাহিব, তবে আর কে চাহিবে? তোমরাও আমার নিকট যেরূপ, উহারাও সেইরূপ। তোমাদের শত শত দোষ দিবারাত্রি মাপ করিতেছি, আর উহাদের দোষ কি আমি মাপ করিব না? কই, বৌমারা ত তোমাদের নামে কখন কিছু বলে না। তোমাদের দেখি কত সুখ্যাতি করে।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি ভগিনী কোন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কি ভগিনীকে প্রহার কি তিরস্কার করিলে, যদি সে তাঁহাকে বলিতে আসিত, তিনি বলিতেন, "অন্যায় কার্য্য করি-য়াছ সেই জন্য মারিয়াছে। আর ওরূপ কার্য্য করিও না, দেখিবে কত ভাল বাসিবে।" পরিশেষে জ্যেষ্ঠ সহোদর কিম্বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সুযোগ-ক্রমে বলিতেন, "আহা, ছোট ছোট ভাই, বোনগুলিকে ওরূপ করিয়া

মার কেন ? উহারা রাত দিন 'দাদা', 'দাদা' 'দিদী', 'দিদী' করিয়া বেড়ায়; তোমাদের কি একটু মায়া মমতা হয় না; ওরূপ অধৈর্য্য কেন ? মিষ্ট কথায় উহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেই হয়।" এইরূপে পরিবার মধ্যে যাহাতে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় সে বিষয়ে ভগবতী দেবী বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তিনি তাহারই উপায় বিধান করিতেন। ফলতঃ ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহাদি অনুরাগেরই অন্তর্ভূত। 'ইহা আমার অনুকূল' এই জ্ঞানই অনুরাগ বা প্রীতির মূলে বর্ত্তমান এবং ইহার বাহ্য প্রকাশই উক্ত ভক্তি ইত্যাদি। কোথায়ও ইহার ব্যভিচার দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহাদি সকলই এই অনুরাগ মহোদধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। ভক্তি বা প্রেম উৎপত্তির পূর্ব্বে ভক্তিভাজন ও প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, অনন্তর 'ইনিই আমার অনুকূল' এবম্বিধ জ্ঞান জন্মে; ক্রমে উহা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করে এবং ঘনীভূত হইতে থাকে। তখনই মানব অন্যবস্তু ভুলিতে থাকে। অবিরত ঐ ছবি তাহার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। অবিশ্রান্ত এই সৌন্দর্য্যময়ী ধারা চিত্তে প্রবাহিত থাকিয়া যাবতীয় পদার্থে সেই মনোমোহন রূপের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া তাহাকে বিচিত্র রসানুভব করাইতে থাকে। ভগবতী দেবী পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মধ্যেও পরস্পরের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি দ্বারা যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়েও সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন।

নবীনা বধূরা তাঁহার স্নেহ মমতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শ্বশুর গৃহে আসিয়া একদিনের জন্যও তাঁহারা মাতার অভাব অনুভব করিতে

পারেন নাই। পিত্রালয় অপেক্ষা শ্বশুরালয়ে তাঁহারা পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

ভগবতী দেবী পুত্রকন্যাদিগকে বিলাসিতা ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে সতত শিক্ষা দিতেন। কন্যাগণকে বলিতেন, "তোমাদের বিবাহ হইলে, স্বামীর নিকট গহনা বা ভাল কাপড়ের প্রার্থনা করিও না। বরং সেই অর্থ যাহাতে পরের দুঃখমোচনে ব্যয় করিতে পার, তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিবে।" ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাসের স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি বিলক্ষণ দ্বেষ ছিল। তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন, "বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে অলঙ্কার দিলে, বাটীতে ডাকাইতি এবং দস্যুর ভয় হইবে। স্ত্রীলোকদিগের মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে, এবং গৃহস্থালী কার্য্যে তাহাদের সেরূপ যত্ন থাকিবে না। দীন দরিদ্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। অলঙ্কার না করিয়া ঐ টাকায় যথেষ্ট অন্নব্যয় করিতে পারিব। তাহাতে দরিদ্র বালকেরা আমাদের বাটীতে ভোজন করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।" বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহারা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতে দিতেন না। কখন কখন কলিকাতা হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র পাঠাইয়া দিলে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের জন্য মোটা বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন। এবং পাকাদি সাংসারিক কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন।

ভগবতী দেবী পারিবারিক প্রত্যেক কার্য্যই শ্রদ্ধাপূতচিত্তে সম্পন্ন করিতেন। গৃহে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, ভগবতী দেবী স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন না করাইলে নিরতিশয় দুঃখানুভব করিতেন। নবাগত ব্যক্তিদিগের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য

তিনি প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। শারীরিক অসুস্থ থাকিলেও তিনি অতিথিদিগকে আহার না করাইয়া শয়ন করিতেন না। অনেক পরিবারে এরূপ দেখা যায় যে, পরিবারস্থ লোকেরা যে প্রকার সুখ ও সুবিধায় আহারাদি করে, অতিথিদিগের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। কিন্তু ভগবতী দেবীর গৃহে সেরূপ বৈষম্য ছিল না। সকলকে সমানভাবে আহার্য্য প্রদত্ত হইত; বরং অভ্যাগতদিগের বিশেষ সমাদর হইত। এক সময়ে স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টার প্রতাপনারায়ণ সিংহ ভগবতী দেবীর গৃহে অতিথি হন। ভগবতী দেবী একখানি থালায় করিয়া স্বহস্তে অন্ন আনয়ন করিলে, প্রতাপনারায়ণ বলিলেন. "বাটীর সকলে যে প্রকার শালপাতায় ভোজন করেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া তদ্রূপ ভোজন করিব।" ভগবতী দেবী এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ঘরের ছেলে। তুমি যে সকলের সহিত একত্র হইয়া শালপাতায় খাইতে চাহিতেছ, ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা। আমার মনে হয় তোমার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়াছে।"

তিনি বিদেশীয় অনুপায় রোগীদের শুশ্রূষাদি কার্য্যে বিশেষরূপ যত্নবতী ছিলেন। কাহারও নিরামিষ ব্যঞ্জন, কাহারও মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাঁহাকে এই কার্য্যে কেহ কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই। বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এই সকল বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতেন। বিবাহিতা বিধবাদের মধ্যে কেহ পীড়িতা হইয়া চিকিৎসার জন্য বাটীতে আসিলে, অথবা অপর কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইলে, ভগবতী দেবী তাঁহাদের মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করিতেন না।

ভগবতী দেবী প্রত্যহ মধ্যাহ্নে রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া এবং আশ্রিত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। হাটবারে হাটুরেরা ফিরিবার সময়, তিনি তাহাদিগের মধ্যে যাহাদের মুখ শুষ্ক দেখিতেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতেন, "আহা, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে। এস, এস আমাদের বাটীতে এস। গরীব ব্রাহ্মণের বাটীতে ডাল ভাত প্রসাদ পাইয়া যাও।" এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন।

কোন বৃহৎ কার্য্য বাটীতে উপস্থিত হইলে, গ্রামের দরিদ্র স্ত্রীজন মাছের পোঁটা, কুটনার খোলা ইত্যাদি লইতে আসিলে, তিনি তৎসঙ্গে তাহাদিগকে কিছু মাছ দিতেন। ঠাকুরদাস ইহা দেখিয়া এক সময়ে বলিলেন, "তুমি এরূপ করিলে, ব্রাহ্মণ ভোজনে কম পড়িবে।" তদুত্তরে ভগবতী দেবী বলিলেন, "তোমার ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবেন, আর এই গরিবেরা কি ভাল জিনিষ খাইবে না?" তদবধি ঠাকুরদাস তাঁহার এই-রূপ বিতরণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতেন।

ভগবতী দেবী ধর্ম্মবোধে পারিবারিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেন। ধর্ম্মবোধেই তিনি নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বিবিধ সদনুষ্ঠানে সতত নিরত থাকিতেন। তিনি দয়া ও পরোপকার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে পবিত্র দেবভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন সদনুষ্ঠানে তিনি কখনও গর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা বিনয় ও শীলতায় শোভিত থাকিত। তাঁহার কোমল প্রকৃতি কখনও অকৃতজ্ঞতায় কলুষিত হইত না

এবং তাঁহার অসামান্য দয়াও কখন পক্ষপাতের ছায়া স্পর্শ করিত না। তিনি সকল সময়েই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। সকল সময়েই পবিত্রতার কমনীয় কান্তি তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিত। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহাকে সকল সময়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন করিয়া রাখিত। তিনি যেন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেন যে, এই জগৎ মধ্যে একজন মহান্ সর্ব্বভারাক্রান্ত চিন্ময় কর্ত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহকারীর ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। সেই সত্যনিষ্ঠ স্বভাবস্থিত পুরুষ, কোন কাল বিশেষ বা স্থান বিশেষের প্রসূত নহেন। প্রত্যুত তিনি যাবৎ সংসারের কেন্দ্রবর্ত্তী; যেখানে তিনি বিদ্যমান, সেইখানেই সৃষ্টিস্থিতিশীলা; এবং তিনিই তোমার আমার ও মানবজাতির এবং অনন্ত ঘটনা প্রবাহের একমাত্র মানদণ্ড। এইরূপ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সংসার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সংসার শান্তি-নিকেতনে পরিণত এবং ঐশ্বর্য্যশ্রীতে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

সন ১২৭৬ সালের শ্রাবণ মাসের শেষে বিদ্যাসাগর ভগবতী দেবীকে কাশীবাস করিবার জন্য পিতৃসন্নিধানে পাঠাইয়া দেন। তিনি কাশীধামে ঠাকুরদাসের নিকট কতিপয় দিবস অবস্থিতি করেন। তদনন্তর অন্যান্য তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার কাশীধামে সমুপস্থিত হন। ভগবতী দেবী ঠাকুরদাসকে বলিলেন, "এখন হইতে এখানে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমি দেশে অবস্থিতি করিলে, অনেক অক্ষম দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবাসিবর্গের অনাথ শিশুগণের আনুকূল্য করিতে পারিলেই আমার মনে সুখ হইবে।

সেই আমার কাশী, সেখানেই আমার বিশ্বেশ্বর।" পাঠকগণ, ভগবতী দেবীর এই উক্তি হইতেই উপলব্ধি করিবেন কিরূপ ধর্ম্মভাবে তিনি সংসার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সংসার সাধনের বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই যেন অতি দীনভাবে বলিতে ইচ্ছা করে "হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তোমার অখণ্ড প্রতাপের পদতলশায়ী হইয়া যেন সতত শিক্ষা করি যে, এই বিশ্ব মধ্যে ধর্ম্মই কেবল মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যশ্রী সৃজন এবং পরিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ।

ভগবতী দেবী বৃদ্ধা শ্বশ্রূদেবীকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় সতত নিরত থাকিতেন। প্রতিদিন স্বহস্তে তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। এইরূপে তিনি গৃহের অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন।

ভগবতী দেবী আজীবন ঠাকুরদাসের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন। দুঃখে কষ্টে ভগবতী যখন ঠাকুরদাসের পার্শ্বে সমাসীন হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিতেন, তখন ঠাকুরদাস সত্য সত্যই মনে করিতেন, তিনি যেন আর ইহ জগতের জীব নহেন; যেন স্বর্গরাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার পার্শ্বদেশে কোন দেবীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার মঙ্গল কামনায় নিরত রহিয়াছেন।*

* O, woman ! in our hours of ease,
Uncertain, coy, and hard to please.
When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou !—*Scott.*

ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাসের দাম্পত্য প্রেম অতীব মধুর ছিল। ফলতঃ প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম জগতে অতি দুর্লভ পদার্থ এবং বহু পুণ্যফলেই লাভ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে মহাকবি ভবভূতির গভীর ভাবপূর্ণ শ্লোকটীই মনে পড়ে :—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসুযৎ—
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারেস্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

যে প্রেম সুখে ও দুঃখে একরূপ, সকল অবস্থায় অনুরূপ, যাহা অবলম্বন করিয়া সাংসারিক দুঃখরাশি নিপীড়িত হৃদয় বিশ্রামসুখ লাভ করে, বার্দ্ধক্যেও যাহার মাধুর্য্য অপহৃত বা বিলুপ্ত হয় না, এবং কালের আবর্ত্তনে লজ্জাদি প্রতিবন্ধকের অপগমে, যাহা পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া স্নেহরসে পরিণত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ অকপট সজ্জনের প্রেম বহু পুণ্যফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পারিবারিক ধর্ম্মের মধ্যে স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন গন্ধবিহীন পুষ্প, বিনয়বিহীন ধার্ম্মিক, মীনহীন সরোবর ও তরুহীন জনপদ অনুশোচ্য ; সতীত্ববিহীন রমণীও ততোধিক অনুশোচ্য। সকল ব্রত অপেক্ষা পাতিব্রত্যব্রত অতি কঠোর। এই ব্রত আত্মোৎসর্গের পূর্ণ বিস্ফুরণ। প্রকৃত পাতিব্রত্য কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নহে ; আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্বও সেই আভ্যন্তরীণ তন্ময়ত্বের বাহ্যক্রিয়া—এই দুইটী ইহার অঙ্গীভূত। স্থূলদর্শীরাই ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিয়া যান। কিন্তু ধর্ম্ম বাহিরের জিনিষ নয়। ইহা হৃদয়ের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ,

সম্ভোগের জিনিষ। যিনি সত্যধর্ম্মের আস্বাদ একবার পাইয়াছেন, তিনি ধন্য হইয়াছেন, কৃতার্থ হইয়াছেন ও অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন। যখন আর্য্যভূমিতে স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত ছিল—স্ত্রীজাতির আপন আপন আদর্শপতি নির্ব্বাচনের অধিকার ছিল,—সেই পবিত্র সরল সত্যনিষ্ঠ পুরাকালেই ভারতে সতীত্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। সতীত্ব গুণে পতিকে দেবভাবে পূজা আর কোন দেশের মহিলা কখন করিয়াছিলেন কি না জানি না। এই সতীত্ব গুণেই ভারতললনা চিরদিন জগতের আদর্শরূপিনী।

মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয়ের আলোচনাই অধিক আনন্দজনক। মানবদেহ যেমন অস্থি, চর্ম্ম, মেদ ও মাংসে গঠিত, মানবাত্মাও সেইরূপ কতিপয় উপকরণে গঠিত হইয়াছে। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, এই ত্রিবিধ চিত্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই, মানবাত্মা কার্য্য করিয়া থাকে। চিন্তা, কল্পনা এবং ধারণা প্রভৃতি অদ্ভুত শক্তি মানুষের মন, এবং প্রেম, সাহস ও ভয় বিরাগাদি অত্যাশ্চর্য্য ভাবরাশি মনুষ্যের হৃদয় অসীম বৈচিত্র্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আবার মানুষের ইচ্ছাশক্তি কি আশ্চর্য্যরূপেই না মানুষের হৃদয় মনের অনুবর্ত্তন ও কার্য্যসাধন করিতেছে! যিনি স্থিরচিত্তে মানব মনের চিন্তাপ্রণালী, মানুষের কল্পনার কমনীয় লীলাচাতুরী, মানব হৃদয়ের বিবিধ ভাবের বিচিত্র তরঙ্গমালা, এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তির অনির্ব্বচনীয় পরাক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া, অপার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে তিনিই সমর্থ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবতী দেবী সংসার সাধনকেই ধর্ম্মসাধন

মনে করিতেন। কিন্তু পাতিব্রত্য ধর্ম্মসাধনে তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরের কোন পরিচয় পাই নাই। বরং 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই ভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর হৃদয়ে দাম্পত্য প্রেম যে কালের আবর্ত্তনে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া স্নেহরসে পরিণত হইয়াছিল, পরস্পরকে প্রীতিসম্পন্ন করিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন দম্পতীই সর্ব্বতোভাবে অভিন্নহৃদয় হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইহলোকে সম্পূর্ণ অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইয়া উঠে না। যেহেতু ভাবাগমের পন্থা বিভিন্নতা হইতেই মানুষ মধ্যে এতাদৃশ মতান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। একজন রূপ, আয়তন, প্রভৃতি বাহ্য গুণসম্পাতের নির্ণয় দ্বারা বস্তু সমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করেন; অন্যজন স্বভাব-সাদৃশ্য বা আভ্যন্তরীণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া পদার্থ সমূহের জাতি প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বুদ্ধি, কিন্তু নিয়তই কারণোন্মুখী, সর্ব্বত্রই তাহাকে পরিস্ফুট ও নিরবচ্ছিন্ন দেখিতে অভিলিপ্সু, সুতরাং বহির্বৈলক্ষণ্য সতত তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। ঋষি, কবি, দার্শনিক প্রভৃতি মনীষিগণের নয়নে সকল বস্তুই মঙ্গলময় ও পুণ্যময়, সর্ব্বকর্ম্ম ও ঘটনা হিতকর এবং মানব মাত্রই দেবগুণসম্পন্ন। কারণ তাঁহাদের চক্ষুঃ সতত জীবনোপরি দৃঢ় আসক্ত, অনুষঙ্গের কোনও লক্ষ্য রাখে না। আবার প্রণয়ের স্বধর্ম্ম বিষয়াবলি সমীপবর্ত্তী হইলেই, স্বকীয় বিশুদ্ধ বহ্নিতে, তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চেষ্টা করে। সুতরাং দম্পতী জীবনে পরস্পরের মধ্যে সম্যক্ অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইয়া না উঠিলেই, অভিমান ও উদ্বেগের উদয় হইয়া কলহের সূত্রপাত করে। অন্য বিবাদস্থলে মৌনাব-

লম্বনই শ্রেয়ঃ, কিন্তু দম্পতী কলহে মৌনাবলম্বন সৎপরামর্শ নহে। তাহাতে কলহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, অথবা বহির্দ্দেশে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্তভূমি দগ্ধ করিয়া ফেলে। যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া সম্মুখ সংগ্রাম করাই এখানকার বিধি। ঠাকুরদাস বীরপুরুষের ন্যায় সম্মুখ সংগ্রামেই অগ্রসর হইতেন।

ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, ঠাকুরদাস বলিলেন, "সৎকুলীন সন্তানকে কন্যাসম্প্রদান করিব।" ভগবতী দেবী বলিলেন, "বড় ঘরে মেয়েকে বিবাহ দিতে হইবে। আমার মেয়ে যেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে যদি বড় ঘরে বিবাহ হয়, তাহা হইলে এ মেয়ে স্বামীর দ্বারা জগতের অনেক মঙ্গলকার্য্য করিতে পারিবে।" এইরূপ মতান্তর হইতে কথান্তর উপস্থিত হয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ, ধনবানের পুত্র হইলেই যে, সে পরোপকার ও সদাব্রতে নিরত থাকিবে এরূপ মনে করিও না। সদনুষ্ঠানের মূলে সৎপ্রবৃত্তি থাকা চাই। সদ্বংশে জন্ম-গ্রহণ করিলে প্রায়ই সৎ হয়। সুতরাং তাহার সৎপ্রবৃত্তি থাকাই সম্ভব। সৎপ্রবৃত্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সে ধনবান্ না হইলেও সদনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ হইবে।" পরিশেষে ভগবতী দেবী ঠাকুরদাসেরই ছন্দানু-বর্ত্তিনী হন। সদ্বংশে কন্যাসম্প্রদান করা হয়। অতঃপর ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে 'মনসা' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রবল ঝটিকার পরেই প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে, কার্য্যের পরই বিরামের স্বভাবতঃ উদয় হয়, এবং বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মনুষ্যসমাজে দৃঢ়তর অধিকার স্থাপন করে। সেইরূপ দম্পতী কলহেরও

চরম ফলটী অতীব মধুর। সুবোধ দান্তস্বভাব পুরুষের কার্য্য যাহাতে ঐ চরম ফলটী শীঘ্র ফলে, তাহার নিমিত্ত যত্ন করেন। অন্যান্য পারিবারিক বিষয় লইয়াও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইয়া কলহে পরিণত হইত। সময়ে সময়ে কাল বৈশাখীর ন্যায় মেঘ, জল, প্রবল বাত্যা বহিয়া যাইত। ভগবতী দেবী ক্রোধাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতেন। ঠাকুরদাস জানিতেন, ভগবতী বৃহৎ মৎস্য অতিশয় ভালবাসেন। তিনি তখন মৎস্য অন্বেষণে বাহির হইতেন এবং যেখানে পাইতেন একটী বৃহৎ মৎস্য আনয়ন করিয়া ক্রোধাগারের দ্বারদেশে সজোরে নিক্ষেপ করিতেন। মৎস্য পতনের শব্দ শ্রবণমাত্র ভগবতী দেবী দ্বার উন্মোচন করিতেন এবং আস্যে হাস্য ও অপাঙ্গে অশ্রু লইয়া বাহির হইতেন। ছাই ও বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিতেন। এইরূপে মধুর মিলন হইত।

এইরূপ পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দে অনেক কাল অতিবাহিত হইল। শেষে একদিন রজনীতে ঠাকুরদাস স্বপ্নে দেখিলেন, বীরসিংহ বাস্তুভিটা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সংসারে ঘোর বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে পর ঠাকুরদাসের অতিশয় মানসিক অশান্তি উপস্থিত হইল। তিনি বীরসিংহ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থবাস করিবেন স্থির-সঙ্কল্প করিলেন। সকলে তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। পরিশেষে তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ভগবতী দেবী সংসারসাধন, দরিদ্রপালন ও সেবা-ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য বীরসিংহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুরদাসের কাশীবাসের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ভগবতী

দেবী সংকল্পিত সদাব্রতানুষ্ঠানের নিমিত্ত আমরণ যত্নবতী ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাস তীর্থযাত্রা কালে তাঁহার মানসিক শান্তি যে অনেক পরিমাণে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১২৭৬ সালে শ্রাবণ মাসে ভগবতী কাশীধামে গমন করেন। এবং সেখানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়া একদিন ঠাকুরদাসকে বলিলেন, "আপনাকে এখনও অনেকদিন বাঁচিতে হইবে। কায়িক অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, এত তাড়াতাড়ি তীর্থস্থানে আগমন করা ভাল হয় নাই। দেশে চলুন, আপনার দ্বারা দেশের লোকের অনেক উপকার হইবে। আর কিছুকাল পরে শেষে তীর্থবাস করিবেন।" কিন্তু ঠাকুরদাস তীর্থবাস পরিত্যাগ করেন নাই।

ভগবতী দেবীর বিবিধ সদ্গুণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। সে সমুদায় পাঠকগণ তাঁহার পারিবারিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহানুভবতা ও পরার্থপরতা।

মানবমাত্রই স্বার্থসাধনে সতত ব্যস্ত। এবং যদিও আপনার মঙ্গল চেষ্টা করা কোনক্রমে দূষণীয় নহে, তথাপি আত্মসার ব্যক্তি অপেক্ষা পরার্থপর ব্যক্তি যে প্রকৃত সাধুপদবাচ্য সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ পরস্পর আনুকূল্য অপেক্ষা করে, কিন্তু সকলে পরার্থসাধনার্থ পরস্পর অনুকূলাচরণ করিলে, কখনই লোকস্থিতি উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে না। পরন্তু জনসমাজ সুশৃঙ্খল হয় এবং অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরার্থপর ব্যক্তিদিগের অভ্যুদয় অধিককাল স্থায়ী হয়। কারণ, আত্মপ্রসাদ তাঁহাদের চিরসঞ্চিত ধন। ফলতঃ যিনি আত্মস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ইহজগতে প্রকৃত মহান্ ও মহানুভব। তিনি যে স্থানে পদসঞ্চালন বা অবস্থিতি করেন, সে স্থান শান্তরসাস্পদ তপোবনেই পরিণত হয়।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপাল, ৩০০৲ টাকা বেতন পান, পুস্তকাদির আয়ও যথেষ্ট, তখন এক সময়ে কোন কার্য্যোপলক্ষে বীরসিংহে আগমন করেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কি কি গহনা পরিবার ইচ্ছা হয়?" তদুত্তরে ভগবতী দেবী বলিলেন, "বাবা, অনেকদিন হইতে আমার তিনখানি

গহনা পরিবার বড়ই ইচ্ছা আছে। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া আমি এযাবৎ তোমাকে বলি নাই। যাহা হউক তুমি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলে, না ভালই হইল। দেখ বাবা, দেশের ছেলেগুলো মূর্খ হইয়া যাইতেছে, ইহাদের বিদ্যাদানের জন্য তুমি একটী দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দাও, এটী আমার মনে বড় সাধ। আর দেখ দেশের গরীব লোকেরা অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারে না, চিকিৎসাভাবে অকালে অনেকে মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং উহাদের প্রাণরক্ষার জন্য একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন কর। আর বাবা, গরিবের ছেলেরা কোথায় থাকিবে, কোথায় আহার করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে? ইহাদের আহার ও বাসস্থানের সুবিধার জন্য একটী অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা কর। বাবা! অনেকদিন হইতে, আমার এই তিনখানি গহনা পরিবার বড়ই ইচ্ছা আছে। মায়ের সাধ পূর্ণ করা উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, এখন মাকে গহনা পরাইয়া তোমার মায়ের অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, জন্মভূমি বীরসিংহ ও তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী লোকগণের ও বালকবৃন্দের মোহান্ধকার নিবারণ মানসে বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, শৈশবকাল হইতে এ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে-ছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিব এই বাসনা অন্তর্নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে তাঁহার অন্তর্নিহিত বাসনারূপ প্রবল অগ্নিতে মাতার আশীর্ব্বাদরূপ পূর্ণাহুতি প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার বাসনাগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর কালক্ষয় না করিয়া পরদিবসই

বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপিত করিলেন। ভূস্বামী রামধন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে মূল্য দিয়া ভূমিবিক্রয়ের কোবালা পত্র লিখাইয়া লইলেন। ইহার পর দিবস মজুর পাওয়া যায় নাই দেখিয়া, বিদ্যাসাগর স্বয়ং কোদাল লইয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত মাটী খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বিদ্যালয় গৃহ শীঘ্র নির্ম্মাণ জন্য পিতৃদেবকে সহস্রাধিক মুদ্রা দিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে চৈত্রমাসে মধ্যম ও তৃতীয় সহোদর ও তৎকালীন বাসায় যে যে আত্মীয় সংস্কৃত কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন,তাঁহাদিগকে দেশস্থ বালকগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যালয় প্রস্তুত হইতে আরও ৪ মাস সময় অতিবাহিত হইবে, একারণ দেশস্থ স্বীয় বাসভবনে ও সন্নিহিত প্রতিবেশী লোকের ভবনে ফাল্গুন মাসে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে এ প্রদেশে কোনও স্কুল স্থাপিত হয় নাই। স্থানীয় অনেকের সংস্কার ছিল, স্কুলে অধ্যয়ন করিলে খৃষ্টান হইয়া যায়। কেহ কেহ বলিতেন, ছেলেরা নাস্তিক হইবে। কোন কোন ভট্টাচার্য্যের সংস্কার ছিল জাতিভ্রংশ হইবে, ইত্যাদি কত লোকে কত কথাই প্রকাশ করিতেন। তৎকালে বীরসিংহবাসী লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। সদ্‌গোপেরা কৃষিকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিত। ইহাদের সন্তানগণ গরু চরাইত; কেহ কেহ অন্যের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া দিনপাত করিত। অনেকের দিনান্তে অন্নসংস্থান দুষ্কর হইল। যাহা হউক, বিদ্যালয় স্থাপন করিবামাত্র ৫।৭ দিনের মধ্যেই প্রায় শতাধিক বালক অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ সন্নিহিত পাথরা, উদয়গঞ্জ, কুরাণ,

গোপীনাথপুর, যদুপুর, দণ্ডীপুর, ঈরপালা, পুড়শুড়ী, মামরুল, আকপপুর, আগর, রাধানগর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রাম হইতে যথেষ্ট বালক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করে, অনেকেরই এমন সঙ্গতি ছিল না। বিদ্যালয় অবৈতনিক হইল। বিদ্যাসাগর, কলিকাতা হইতে প্রায় ৩০০ তিন শতের অধিক বালকের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং কাগজ, শ্লেট প্রভৃতি অকাতরে প্রেরণ করিলেন। স্বগ্রামের যে যে ছাত্রের বস্ত্রাভাব ছিল, তাহাদিগকে বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিবার জন্য, শম্ভুবাবুকে আদেশ দিলেন। ঐ সময়ে বিদেশস্থ অনেক অধ্যাপকের পুত্র, অধ্যয়ন মানসে বীরসিংহে সমাগত হইল।

যাহারা অন্যের বাটীতে বেতন গ্রহণ করিয়া দিবসে গরু চরাইত, বা যাহারা দিবসে কৃষিকর্ম্ম করিত, তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর নাইটস্কুল স্থাপন করিলেন। ঐ স্কুলে সন্ধ্যার পর রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। বিনামূল্যে পুস্তক বিতরিত হইত। এই সকল বিষয়ে যাহা ব্যয় হইত, তাহা বিদ্যাসাগর স্বয়ং বহন করিতেন।

বিদ্যাসাগর একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। সকলেই বিনামূল্যে ঔষধ পাইত। বীরসিংহ, বোয়ালিয়া, পাথরা, মামুদপুর প্রভৃতি সন্নিহিত গ্রামে কাহারও বাটীতে চিকিৎসা করিতে হইলে, পদব্রজে যাইয়া বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ব্যতীত দুঃস্থ লোককে পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি দেওয়া হইত।

তৎকালে এ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিক্ষা করিত না। বীরসিংহে সর্ব্বাগ্রে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকল বালিকাই

বিনামূল্যে পুস্তক পাইত। বীরসিংহে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে প্রতিবেশিবর্গ সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব দুহিতাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। তজ্জন্য, সন্নিহিত অপরাপর গ্রামস্থিত লোক সকলও কোনও প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বালক বিদ্যালয়ে প্রথমতঃ বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারাদির শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছুদিন পরে অধিক সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন না করাইয়া, রীতিমত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যাসাগর উক্ত বিদ্যালয়ের মাষ্টার ও পণ্ডিতের বেতন মাসিক ৩০০৲ টাকা প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত পুস্তকাদির জন্য মাসিক অন্ততঃ ১০০৲ টাকা ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম আত্মীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার তাঁহার ফাষ্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, থার্ডবুক প্রভৃতি পুস্তকগুলি বালকদিগের পাঠার্থ বিনামূল্যে দান করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহে বালিকা বিদ্যালয়ে মাসে মাসে ৩০৲ টাকা ব্যয় করিতেন। ডাক্তারখানায়, ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের বেতন এবং অন্যান্য খরচ ও ঔষধাদির মূল্য প্রভৃতিতে মাসে মাসে ১০০৲ টাকা ব্যয় করিতেন। নাইট্ স্কুলে প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা ব্যয় করিতেন। বীরসিংহ বিদ্যালয়ের ও নাইট্ স্কুলের অনেক দরিদ্র বালক বাটীতে ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণ তনয়কে নিজ বাটীতে অন্ন দিয়া, বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতেন। ন্যূনাধিক ৬০ জন বালক বাটীতে ভোজন করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিত। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরদাস বলিতেন যে, আমি বাল্যকালে বিলক্ষণ অন্ন কষ্ট পাইয়াছি, অতএব অন্নব্যয় করা আমার

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম। তিনি কুমারগঞ্জের হাটে যাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতেন। ছাত্র সকলকে এবং পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রদিগকে একত্র বসাইয়া আহার করাইতেন। ভগবতী দেবী সন্তুষ্টচিত্তে স্বয়ং রন্ধন পরিবেশনাদি কার্য্য প্রতিদিন সমভাবে নির্ব্বাহ করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যখন ৫০০৲ টাকা বেতন হয়, তখন তিনি এক সময়ে কার্য্যোপলক্ষে দেশে আগমন করিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, আর তোমার মনে কি সাধ আছে আমায় বল।" ভগবতী দেবী বলিলেন, "বাবা, এইবার যেথানে যত দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহাদের একটা মাসহরার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতার অভিলাষানুযায়ী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাঁহাদের হীন অবস্থা ছিল, এমন কি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের পরিবার সংখ্যানুযায়ী মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ সময়ে যে সকল লোক অন্নসত্রে ভোজন করিয়াছিল, তাহারা অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রামস্থ ঐ সকল দরিদ্র লোকের অবস্থা অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এবং অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, উহাদের মধ্যে অনেকেই অতি কষ্টে এক সন্ধ্যা ভোজন করিয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসরের মধ্যে এক দিন জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়া ৬।৭ শত টাকা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে এই অর্থ দ্বারা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল?" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবতী দেবী উত্তর করিলেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে

পাইলে, পূজা করিবার আবশ্যক নাই। তুমি গ্রামবাসীদিগকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে, আমি পরম আহ্লাদিত হইব"। জননীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হন এবং গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন যে, "তোমরা সকলে ঐক্য হইয়া, গ্রামের কোন্ কোন্ ব্যক্তির অত্যন্ত অন্নকষ্ট ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি নিরাশ্রয়, তাহাদের নাম লিখিয়া দাও, আমি মাসে মাসে উহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিব।" গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই তালিকা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়া মধ্যম ভ্রাতা শম্ভূচন্দ্রের নিকট প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বাবধি যেরূপ নিরুপায় আত্মীয়দিগকে ও বিধবা বিবাহ সম্পর্কীয় নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে তালিকানুযায়ী টাকা বিতরণ করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ এই তালিকানুসারে গ্রামস্থ নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে মাসে মাসে টাকা দিবে এবং সময়ে সময়ে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে আমায় লিখিবে।" যিনি ধনশালী ব্যক্তি নহেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ দান সহজ ব্যাপার নহে। ধন্য মাতা! ধন্য পুত্র!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লোকানুরাগ ও সেবাধর্ম্ম।

সন ১২৭২ সালে ঐ প্রদেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত কিছুমাত্র ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর হয়। ঐ সালের পৌষ মাসে কোন কোন কৃষক যৎসামান্য ধান্য পাইয়াছিল, তাহাও প্রায় মহাজনগণ আদায় করেন। কৃষকদের বাটীতে কিছুমাত্র ধান্য ছিল না। দুঃসময় দেখিয়া ভদ্রলোকেরা ইতর লোকদিগকে কোনও কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন নাই। সুতরাং যাহারা নিত্য মজুরি করিয়া দিনপাত করিত, তাহাদের দিনপাত হওয়া সুকঠিন হইল। এই সময়ে টাকায় পাঁচ সের চাউল বিক্রয় হইত, তাহাও সকল সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই তিন মাস অনেকেই ঘটী বাটী ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করে। পরে চাউল ক্রয়ে অপারক হইয়া, কেহ কেহ বুনো ওল ও কচু খাইয়া দিনপাত করে এবং নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিয়া অনাহারে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। শত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদরের জ্বালায় কলিকাতায় প্রস্থান করিয়াছিল ও তথায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিত। ৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে জাহানাবাদ মহকুমায় প্রায় অশীতি সহস্র লোক অন্নাভাব প্রযুক্ত কলিকাতায় যাইয়া তথাকার অন্নসত্রে ভোজন করিত। তৎকালে কেহ জাতিবিচার করে নাই। জননী সন্তানকে

পথে ফেলিয়া দিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করেন। অনেক কুলকামিনী জাত্যভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া জাত্যন্তরিতা হয়। চতুর্দ্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করে নাই, সকলেই অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল।

বীরসিংহবাসী অধিকাংশ লোক প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। তাহাদিগকে ভোজন না করাইয়া কেহ ভোজন করিতে পারিতেন না। কোন কোনও দিন রাত্রিতেও সন্নিহিত গ্রামের ভদ্রলোকগণ উদরের জ্বালায় দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতেন, তাঁহাদিগকে ভোজন না করাইলে সমস্ত রাত্রই চীৎকার করিতেন। এইরূপ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রায় শতাধিক নিরন্ন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় দিবারাত্রি চীৎকার করিয়া বেড়াইত।

ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর চতুর্দ্দিকে বিদেশী ও স্বদেশস্থ অসংখ্য দীন দুঃখী সমবেত হইতে লাগিল। করুণাময়ী, দীনজননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ভগবতী দেবী কি আর স্থির থাকিতে পারেন? নিরন্ন দীনহীন সন্তানগণের মর্ম্মভেদী চীৎকারধ্বনিতে দীন জননীর কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ভগবতী দেবী অন্নহীনজনের অন্নদানার্থ অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ং রন্ধন করিয়া অন্নসত্রের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে ভোজন করাইতেন। তাহাদিগের ভোজনের সময় তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতেন। তাহারা যেরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত ভোজন করিত, সে দৃশ্য যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শ করিত। হৃদয়ের প্রবল আবেগ তিনি আর সম্বরণ করিতে

পারিতেন না। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইত। এ দৃশ্য কি মধুর! কি হৃদয়স্পর্শী! ভগবতী দেবী একদিন ঠাকুরদাসকে যে বলিয়াছিলেন, "সেই আমার কাশী, সেইখানেই আমার বিশ্বেশ্বর।" * পাঠকগণ, চক্ষু থাকে নিরীক্ষণ করুন, হৃদয় থাকে অনুভব করুন, ক্ষুদ্র বীরসিংহপল্লী সত্য সত্যই আজ কাশীধামে পরিণত হইয়াছে কি না? কাশীধামের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত কি না! শুদ্ধ অন্নদান করিয়াই মাতা আজ ক্ষান্ত নহেন। পাঠকগণ, ঐ দেখুন সন্তানগণের রুক্ষ কেশপাশ দেখিয়া মাতা কিরূপ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন! দরিদ্রগণের ভোজনান্তে ভগবতী তিন কন্যা সমভিব্যাহারে তাহাদিগের মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন। মাতার স্নেহের উৎস আজ উদ্বেলিত—উচ্ছলিত। প্রেমের প্রবল বন্যা অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত। সেই প্রবল প্রবাহে আজ হাড়ি, ডোম, তিওর, বাগ্দী জাতিবিচার ভাসিয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন, কন্যাগণ নারিকেল তৈল ও বাটা হলুদ স্ত্রীলোকদিগকে মাখাইয়া দিতেছেন, আর ভগবতী দেবী সধবা-দিগের ললাটে স্বয়ং সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিতেছেন! ধন্য পুণ্যের লীলা-ক্ষেত্র ভারতভূমি! এ দৃশ্য মর্ত্ত্যভূমির? না—সুরধামের!

হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদদাতা ১২৭৩ সালের ১৫ই শ্রাবণ এই হৃদয়-স্পর্শী সেবাব্রত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা প্রত্যহ ৪।৫ শত লোককে অকাতরে, অকুণ্ঠিতচিত্তে অন্ন-দান করিতেছেন।"

ক্রমে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন এই

* ৺শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর চরিত।

সংবাদ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইল। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, "স্বগ্রাম বীরসিংহ ও উহার সন্নিহিত ৫।৬টী গ্রামের দরিদ্রগণকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে পারিব। অন্যান্য গ্রামের লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইতে পারি? যেহেতু আমি ধনশালী লোক নহি। অপরাপর গ্রামের দরিদ্রদিগকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এমন স্থলে জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে আমার নাম করিয়া বলিবে যে, তিনি জাহানাবাদ মহাকুমার দুর্ভিক্ষের কথা গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলে, আমি এখানে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সিসিল বীডনকে বলিয়া সাহায্য করাইতে পারিব।"

বিদ্যাসাগর, নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ ও তৎসংলগ্ন পাথরা, কেঁচে, অর্জ্জুনআড়ী, বুয়ালিয়া, রাধানগর, উদয়গঞ্জ, কুরাণ, মামুদপুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামবাসী নিরুপায় লোকদিগের প্রতি দয়া করিয়া, বীরসিংহে অন্নসত্র স্থাপন করেন। প্রথমতঃ গ্রামস্থ লোকদিগের ভোজন করিবার এই ব্যবস্থা হয় যে, যে ভদ্রলোক অন্নসত্রে ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাঁহারা লোকসংখ্যা হিসাবে আহার্য্য পাইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কলিকাতা আগমন করেন। শ্রাবণ মাসে স্বতন্ত্র বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়। ভাদ্র মাস হইতে রাধানগর, কেঁচে, অর্জ্জুনআড়ী, প্রভৃতি চতুর্দ্দিকের লোক আসিয়া ভোজন করায়, ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এই সমাচার কলিকাতায় বিদ্যাসাগরকে লিখিলে, তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "অভুক্ত যত লোক আসিবে, সকলকেই সমাদর পূর্ব্বক ভোজন করাইবে, কেহ যেন অভুক্ত ফিরিয়া না যায়। শীঘ্র টাকা পাঠাইতেছি এবং আমিও

সত্বর বাটী যাইতেছি।" যে কয়েক মাস দেশে অন্নসত্র ছিল, সেই সময়ে তিনি মাসে প্রায় একবার করিয়া বাটীতে আগমন করিতেন।

অনেক নিরুপায় দরিদ্র লোক, ছোট ছোট বালক বালিকাগণকে ঐ অন্নসত্রে ফেলিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। এই বালক বালিকাগণের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত করা হয়। অন্নসত্রে গর্ভবতী কয়েকটী স্ত্রীলোক প্রত্যহ ভোজন করিত। প্রসবের পর তাহাদিগের নবপ্রসূত সন্তানগণের দুগ্ধ ও প্রসূতির পথ্যের ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পর ঐ প্রসূতিদের মধ্যে একটী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, উহার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক নিযুক্ত হয়। ঐ সন্তানের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। অন্নসত্র খুলিবার প্রথমাবস্থায় দেখা গিয়াছে, যে কেহ কেহ স্বীয় প্রাণসম সন্তানগণের হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং সমস্ত খাইয়া ফেলিত। তৎকালে কেহ কাহারও প্রতি স্নেহ মমতা করিত না। সকলেই সতত স্ব স্ব উদরের জ্বালায় বিব্রত ছিল। কিছু দিন পরে ঐ ভাব তিরোহিত হইয়া যায়। অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত, তাহারা পাছে মুচি, হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় দূর হইতে তৈল দিত। ইহা দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন। নীচ বংশোদ্ভবা স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ দয়া দেখিয়া, তাহারা পরম

আহ্লাদিত হইয়াছিল এবং কর্ম্মচারিগণ তাঁহার এরূপ দয়া অবলোকনে, তদবধি উহাদিগকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিত না। পরিবেশনের সময় বিদ্যাসাগর স্বয়ং পরিবেশন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন দেখিয়া, উপস্থিত ভদ্রলোকেরাও যোগ দিতেন।

অন্নসত্রে যাহারা ভোজন করিত,তাহারা বিদ্যাসাগরের নিকট প্রকাশ করিয়া বলে, "মহাশয়! প্রত্যহ খেচরান্ন খাইতে অরুচি হয়, সপ্তাহের মধ্যে একদিন অন্ন ও মৎস্য হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়।" একারণ প্রতি সপ্তাহে একদিন অন্ন, পোনা মৎস্যের ঝোল ও দধি হইত। ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় বিদ্যাসাগর অকাতরে যথেষ্ট টাকা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেশস্থ লোক মনে করিত যে, বিদ্যাসাগর বিদ্যোৎসাহী, একারণ দরিদ্র বালকদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও রাখালস্কুল স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দরিদ্রগণের প্রতি এতদূর দয়ালু ছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। এই অবধি সকলে তাঁহাকে বলিত যে, ইনি দয়াময় অথবা দয়ার সাগর। নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় স্বয়ং তৈল মাখাইয়া দেন, ইনি ত মানুষ নন,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তৎকালে ঐ প্রদেশে সকলেই এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্ট অন্নসত্রে দরিদ্রদিগকে কর্ম্ম করাইয়া খাইতে দিতেন; এজন্য কতকগুলি লোক কর্ম্ম করিবার ভয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নসত্রে ভোজন করিতে আসিত। তজ্জন্য ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখানে পীড়িতদিগের চিকিৎসা হইত, এবং রোগীদিগের পথ্যের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। গ্রামস্থ ভদ্রলোকের মধ্যে যাহাদের

অবস্থা অতি মন্দ, তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে বেলা ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত আহার্য্য দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০টী পরিবার প্রত্যহ আহার্য্য লইতে লজ্জিত হইতেন; তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে গোপনে নগদ টাকা দেওয়া হইত। খাতায় নাম লেখা ব্যতীত আরও ২৫।২৬টী গৃহস্থ রাত্রিতে গোপনে চাউল, ডাইল ও লবণ লইয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, খাতায় ইঁহাদের নাম লিখিতে বারণ করিয়া দেন। যে যে ভদ্রপরিবারের বস্ত্র ছিল না, তাঁহারা প্রকাশ্যে বস্ত্র লইতে লজ্জিত হইবেন, একারণ প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র গোপনে বিতরিত হয়। সন্ধ্যার পর বিদ্যাসাগর স্বয়ং বস্ত্র লইয়া মোটা চাদর গাত্রে দিয়া বস্ত্র বিতরণ করিবার জন্য অনেক ভদ্রলোকের বাটীতে গমন করিতেন এবং বলিতেন, "ইহা কাহারও নিকট বলিবার আবশ্যক নাই।" তিনি ভদ্রলোকদিগকে অতি গোপনে দান করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ধৈর্য্য ও সৎসাহস।

জন্মগ্রহণ করিলেই মনুষ্যকে বিপদ, কষ্ট, অভাব, যন্ত্রণা ও হানি সহ্য করিতে হয়। অতএব সাহস ও ধৈর্য্য দ্বারা চিত্তকে দৃঢ়ীভূত করা মানবমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে দুঃখের অংশ বহন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। মরুভূমির মধ্যে উষ্ট্র যেমন শ্রম, তাপ, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে, কাতর হয় না; ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিও সেইরূপ বিবাদ এবং কষ্টে পতিত হইয়াও সৎসাহসেরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। উন্নতমনা, ওজস্বী ব্যক্তি অদৃষ্টের প্রতিকূলতাকে অবজ্ঞা করেন; তাঁহার মনোমাহাত্ম্য কিছুতেই খর্ব্ব হইবার নহে। তিনি সাগর-শৈলের ন্যায় সংসার-জলধির বক্ষে অবস্থিতি করেন; বিপদরূপ তরঙ্গের আঘাতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। বিপদের সময় সাহস তাঁহার অন্তঃকরণে বলের সঞ্চার করে এবং তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য তাঁহাকে বহন করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করে। রণোন্মুখ সৈনিকের ন্যায় তিনি বিপদের সম্মুখীন হন, এবং হস্তে বিজয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল্ এবং তাঁহার পুস্তকের দ্বারা অর্থাগমের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল, তখন তিনি দেশে আগমন করিলে, বীরসিংহ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের দীন দরিদ্র অবস্থাহীন

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

ব্যক্তিবর্গকে আপনার সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি চাদরে টাকা বাঁধিয়া, লোকের গৃহে গৃহে যাইয়া গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেন। এইরূপ গোপনে অর্থ সাহায্য করিবার কারণ এই যে, এই সকল লোক অবস্থাহীন বটে, কিন্তু ভদ্রপরিবার ভুক্ত, সুতরাং প্রকাশ্যে অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা করা নিশ্চিত তাহাদের পক্ষে ঘোরতর লজ্জাজনক বিষয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৫৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রজে ৬ ক্রোশ অন্তর চণ্ডীতলা গ্রামের এক পান্থ নিবাসে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক পরদিবস পদব্রজেই তথা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তর বীরসিংহে নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী ও প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

পরদিবস হইতে গ্রামস্থ নিরুপায়দিগকে যথাসাধ্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অনেকে ইহাঁকে ধনশালী বলিয়া স্থির করিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের যোগে ৩০ বৈশাখ বীরসিংহের বাটীতে ডাকাইতি হয়। ঐ দিবস সকলে রাত্রি নয়টার পর ভোজনান্তে অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছিলেন,বহির্বাটীতে প্রায় ৩০জন পুরুষ নিদ্রা যাইতেছিলেন,এতদ্ব্যতীত দুইজন গ্রাম্য চৌকিদারও জাগরিত ছিল। নিশীথ সময়ে বাটীর সম্মুখে প্রায় ৪০জন লোক ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। এই চীৎকারধ্বনি শ্রবণে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন দস্যুগণ মশাল জ্বালিয়া মধ্যদ্বার ভাঙ্গিতেছিল, তদ্দর্শনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ভীত হইলেন। সকলে অলক্ষিত ভাবে খিড়কির দ্বার দিয়া তাঁহাকে লইয়া বাটী হইতে প্রস্থান

করিলেন। দস্যুগণ বিদ্যাসাগরকে ধরিতে পারিলে, টাকার জন্য বিলক্ষণ যাতনা দিত। দস্যুরা জ্বলন্ত মশাল ও উন্মুক্ত তরবারি হস্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ভগবতী দেবী সুযোগ বুঝিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। সেই বৎসর ঈশান বাবুর বিবাহের বৎসর। বিবাহের জন্য অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। ভগবতী দেবী সেই গহনার বাক্স লইয়া যখন নিম্নে অবতরণ করেন, তখন এমনি ঘটিল যে এক প্রবল বাতাসে দস্যুগণের সমস্ত মশাল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। ভগবতী তখন অন্ধকারে নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং কৌশল পূর্ব্বক খিড়কীর দ্বার দিয়া গহনার বাক্স লইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর দস্যুগণ যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিল। রাত্রিতেই ঘাঁটাল থানার দারোগার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি পরদিন প্রাতে বীরসিংহে আগমন করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিদের প্রথানুসারে গোলমাল করায়, ঠাকুরদাস বলিলেন, "আপনি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া আপনার মর্য্যাদা রাখিতে পারি, কিন্তু এসম্বন্ধে আপনাকে কিছু দিতে পারি না।" অনন্তর ঠাকুরদাস, পরিবারবর্গের কাহারও দ্বিতীয় বস্ত্র ও ঘটী, বাটী, থালা ইত্যাদি কিছুমাত্র না থাকায় এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য উদয়গঞ্জ ও খড়ার গ্রামে গমন করিলেন। ইত্যবসরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটীর সম্মুখে ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ লইয়া কপাটী খেলা আরম্ভ করিলেন। দারোগা বাবু ফাঁড়িদারকে বলিলেন, "এ বামুনের (ঠাকুর-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের) এত কি জোর যে, আমি দারোগা, আমার মুখের উপর জবাব দেয় যে একপয়সাও দিব না। এবং ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই ছোঁড়াটা কি রকমের লোক? কল্য ডাকাইতি হইয়াছে,

আজ সকালেই বাটীর সম্মুখে কপাটী খেলিতেছে।" ফাঁড়ীদার বলিল, "হুজুর, ইনি সামান্য লোক নহেন। ইনি দেশে আসিলে, জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, বন্ধুভাবে এখানে আসিয়া ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এবং শুনা যায় যে, বড়লাট ও ছোটলাট সাহেবের সহিত ইহাঁর বন্ধুত্ব আছে। ইহাঁর মত লইয়া জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাল হয়।" ইহা শুনিয়া দারোগা বাবু স্তব্ধ হইয়া শান্তভাবে কার্য্য করিলেন। কিন্তু ডাকাইতির কোন সন্ধান হইল না।

সন ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে আর এক ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। বীরসিংহের পৈতৃক বাসভবন নিশীথ সময়ে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অগ্নি যখন চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সম্মুখে যে যাহা পাইল, তাহা লইয়া প্রাণভয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া ভগবতী দেবীর মনে পড়িল, কনিষ্ঠ পুত্র ভূতনাথ গৃহে নিদ্রিত। তখন তিনি আর্দ্র কন্থায় গাত্র আবৃত করিয়া সেই প্রজ্বলিত গৃহ মধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন এবং সুপ্ত সন্তানকে জাগরিত করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং সেই কক্ষে গহনার বাক্স রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, পুত্র ও সেই গহনার বাক্স লইয়া দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আসিবার সময় কে যেন আমার পথ মুক্ত করিয়া আমাকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিল।" সকলের জীবন রক্ষা হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্রব্যাদি কিছুমাত্র রক্ষা হয় নাই। বিদ্যাসাগর, এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দেশে আগমন করিলেন। মাতৃ-

দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য যত্ন পাইলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি কলিকাতায় যাইব না। কারণ যে সকল ছাত্রগণ বাটীতে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, তাহারা কি করিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে? কে দরিদ্র বালকগণকে স্নেহ করিবে? বেলা দুই প্রহরের সময় অতিথি সকল ভোজন করিবার মানসে এখানে সমাগত হইলে, কে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিবে? যে সকল কুটুম্ব আগমন করিবেন, কে তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইবে?" ভগবতী দেবী কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন না। তজ্জন্য বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ষাকাল সমাগত; একারণ বিদ্যাসাগর তাঁহার বাসার্থ সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার।

সদসদ্-বিচারণাই নৈতিক শিক্ষার ফল। আবার এই নৈতিক শিক্ষা হইতেই বিনয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্গুণলাভ হইয়া থাকে। বিনয় ও শিষ্টাচার ব্যতিরেকে কোন শিক্ষাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। যে ব্যক্তি ব্যবহারে ও কথোপকথনে বিনয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে না পারে,এবং যে ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিয়া সদসদবধারণে অক্ষম, সে ভদ্রসমাজে কখনই সমাদর প্রাপ্ত হয় না। তাহার জ্ঞানার্জ্জন পণ্ডশ্রম মাত্র, তাহার বিদ্যা বিড়ম্বনা ও তাহার উপাধি ব্যাধিস্বরূপ।

যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর"। ব্যাসদেবও বলিয়াছেন, "আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।"—যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা অন্যের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এই সকল মহাবাক্য সতত মনে জাগরূক রাখা উচিত। যখন তুমি মাতাপিতার স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের প্রীতি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর ভক্তি, বন্ধুজনের প্রণয় ও অনুরাগ পাইবার বাসনা কর, তখন তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ ও অনুরাগ প্রকাশ না করিবে কেন? যে অন্যকে দয়া করিতে জানে না, অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারে না, পরিজনগণের

প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না, সে পরম পিতার দয়া, ক্ষমা ও স্নেহ কি প্রকারে আশা করিতে পারে ?

প্রিয় বাক্যেই জগৎ তুষ্ট হয়। যাঁহার রসনায় অমৃত আছে, সংসার তাঁহার নিকট অমৃতময়। তিনি ইহ জগতে থাকিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারেন। প্রিয়বাদীর কেহ পর নহে। বিনয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচারে পরও আপন হয়, শত্রুও মিত্র হয়। সর্ব্ববিষয়ে উদারতা প্রকাশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। চিত্ত উদার হইলে, বসুধাবাসি জীবগণ আত্মীয়স্থানীয় হয়। সংসারে কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না ; ব্যবহারেই শত্রু বা মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি সর্ব্বজীবে আত্মবৎ ভাবিতে পারেন, তিনিই সাধু; আত্মপ্রাণ যেমন অভীষ্ট, পরের প্রাণও তদ্রূপ, ইহা বিবেচনা করিয়া যিনি আত্ম তুলনায়, অপরের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই মানব-নামের যোগ্য।

১২৭১ সালে বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হারিসন্ সাহেব ইনকম্‌ট্যাক্সের তদন্তের জন্য কমিশনর নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন হারিসন্ সাহেবকে বীরসিংহের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। হারিসন্ সাহেব বলেন,—"হিন্দু প্রথানুসারে বাটীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী নিমন্ত্রণ না করিলে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না।" সুতরাং হারিসন্ সাহেবের কথানুযায়ী বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সাহেব বীরসিংহ গ্রামে আগমন করিয়া হিন্দু প্রথানুসারে দণ্ডবৎ হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে প্রণাম করিলেন। তিনি হিন্দু প্রথানুযায়ী যোগাসনে বসিয়া আহারাদি সমাপন করিয়া

ছিলেন। ভগবতী দেবী সাহেবের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। সাহেব তাঁহার সদ্ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক, সাহেবের ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া উপস্থিত সকলে ও সাহেব পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভগবতী দেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি উচ্চ জাতীয়, কি নীচ জাতীয়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি ; ইহা জানিতে পারিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

ভোজনান্তে হারিসন্ সাহেব ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কত ধন আছে ?" ভগবতী দেবী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—"বাবা, চারি ঘড়া ধন আছে।" সাহেব বলিলেন—"আপনার এত ধন আছে ?" ভগবতী তখন সহাস্য বদনে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অপর তিনটী পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এই আমার চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বিস্মিত হইয়া বিদ্যাসাগর ও উপস্থিত জন সমূহকে বলিলেন,—"ইনি দ্বিতীয় রোমীয় রমণী কর্ণিলিয়া।"

তৎপরে ভগবতী দেবী হারিসন্ সাহেবকে বলিলেন, "দেখ বাবা, তুমি অতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার লইয়া এই জেলায় আসিয়াছ। দেখিও যেন গরীব দুঃখীর অনিষ্ট না হয়। তুমি এরূপ ভাবে কার্য্য করিবে যে, তুমি এ জেলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও যেন লোকে তোমার জন্য 'হায়' 'হায়' করে।" সাহেব ভগবতীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইলেন। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "এমন মা না হইলে, আপনি ঐরূপ হইতে পারিতেন না। মাতার গুণেই আপনি স্বভাবতঃ উন্নতমনা হইয়াছেন।"

তৎপরে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসতবাটীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন। এবং সকল স্থানই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়া বলিলেন, "আমি অনেক বাটীতে পদার্পণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ আমার কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। জানিলাম, আপনার মাতৃদেবী অশেষ গুণান্বিত। ইঁহার তুলনা নাই।"

হারিসন্ সাহেব এক সময়ে কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি একস্থানে উল্লেখ করিয়াছিলেন, "আপনার জননীর উপদেশানুযায়ী আমি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সতত যত্নবান্ আছি। তাঁহাকে বলিবেন যে, তাঁহার মুখনিঃসৃত অনুশাসনরূপ অমৃতময় বচনাবলী সতত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া আমাকে সৎকার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে।"

ভগবতী দেবী সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার গুণে যে কেবল বীরসিংহ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের ও আত্মীয় স্বজনের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার গুণে একজন বিদেশী, ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, পাঠকগণ, উপলব্ধি করিয়া দেখুন, উল্লিখিত দৃষ্টান্তই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে কি না!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দয়া ও পরোপকার।

দুঃখভারাক্রান্ত ও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিবার জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে দয়াগুণ প্রদান করিয়াছেন। দয়ালু ব্যক্তি পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার দানের ক্ষেত্র। পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে এবং সকল শাস্ত্রেই দয়ার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্টিগোচর হয়। দানসম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয় না। দয়ার কার্য্যে জাতি, ধর্ম্ম, কিংবা কুলশীলের বিচার নাই। নিম্নভূমিতে যেরূপ জল ধাবিত হয়, সেইরূপ দীন দুঃখী দেখিলেই দয়াশীল ব্যক্তির দয়ার স্রোত প্রবাহিত হয়। কত শত কৃপাবান্ মহাত্মা দয়াপরতন্ত্র হইয়া, পরোপকারকার্য্যে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয়, পরের উপকার করিবার জন্যই যেন তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, মনে করিলে, সকল লোকেই পরের উপকার করিতে পারেন। ধন থাকিলেই যে, পরের উপকার করিতে পারা যায় তাহা নহে ; শরীর, মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারাও অপরের বিস্তর উপকার করা যায়। ফলতঃ যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপে পরের উপকার করিতে পারেন। দয়ালু ব্যক্তিরা কেবল মানবের উপকার করিয়াই যে ক্ষান্ত থাকেন, তাহা নহে। জীবমাত্রই তাঁহাদের দয়ার পাত্র। অক্ষম, রুগ্ন,

দুর্ব্বল এবং বৃদ্ধ ইতর প্রাণী দেখিলেই তাঁহাদের কৃপাসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠে। দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান, এই সকলই দয়ার কার্য্য। দয়ালু মহোদয়গণ বিবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিনিয়ত জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

মনুষ্যজাতির মধ্যে দয়াবৃত্তি রমণীহৃদয়ে অধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। রমণী জাতি দয়া-পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র। তাঁহাদের দয়ায় স্বার্থরূপ মলিনতার লেশমাত্র নাই। বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর দয়া কিন্তু সাধারণ রমণী হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল। তাঁহার দয়া অলৌকিক; তাহা কোন প্রকার শাস্ত্র বা লোকাচারপ্রথায় আবদ্ধ ছিল না। বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দের উপর তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয়ের করুণাবারি সতত বর্ষিত হইত। তাঁহার সেই উন্নত হৃদয়, রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শোকাতুরের শোকে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সতত ব্যস্ত থাকিত।

ভগবতী দেবী সর্ব্বদাই গ্রামস্থ অভুক্ত লোকদিগকে ভোজন করাইতেন। স্থানীয় প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইলে, সর্ব্বদাই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিদেশীয় যে সকল রোগিগণ চিকিৎসার জন্য বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিত, তিনি স্বয়ং তাহাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি পাক করিয়া দিতেন। যে সকল দরিদ্র প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকিত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং সময়ে সময়ে অনেকের আপদ বিপদে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। ভগবতী দেবীর দানের জন্য যখন যাহা আবশ্যক হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিলম্বে তাহা পাঠাইয়া দিতেন। তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কার্য্য অবিলম্বে সম্পন্ন করিতেন।

প্রতি বৎসরেই বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করিয়া অনেক দীন দরিদ্রের কর্ম্ম করিয়া দিতেন। বৎসরের মধ্যে নূতন নূতন অনেক কুটুম্ব ও গ্রামস্থ অনাথগণের মাসহারা করাইয়া দিতেন। গ্রামে বিদ্যালয়সংস্থাপনের পূর্ব্বে গ্রামস্থ প্রায় সকল লোকেই দরিদ্র ছিল। কেহ লেখাপড়া জানিত না। কেহ চাকরী করিত না। সকলেই সামান্য কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। সংবৎসরের পরিশ্রমলব্ধ সমস্ত ধান্য পৌষ মাসেই মহাজনগণ বলপূর্ব্বক এক কালেই লইয়া যাইতেন। গ্রামের প্রায় অনেক লোক এক সন্ধ্যা আহার করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিত। ভগবতী দেবী গ্রামস্থ অনেককেই টাকা ধার দিতেন, কিন্তু কাহারও নিকট পাইবার আশা রাখিতেন না।

কেহ দেনা শোধ করিতে অক্ষম হইলে, তিনি তাহার নিকট হইতে আসল টাকা পর্য্যন্ত লইতেন না। তিনি বলিতেন, "উহাদের অভাব দূর করিবার জন্যই ত টাকা ধার দেওয়া ; অর্থসঞ্চয় করা ত আমার উদ্দেশ্য নহে।" তিনি এমনই দয়াবতী ছিলেন যে, অক্ষম অধমর্ণগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিলে, তাহাদিগকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিতেন, "অবস্থা ভাল হয়, দিবি। না হয় না দিবি, তার জন্য কাঁদিস্ কেন ?"

অর্থের প্রয়োজন হইলে, মধ্যে মধ্যে তিনি এইরূপ টাকা আদায় করিতে বাহির হইতেন। কেহ বা তখন হলুদ বাটিয়া তাঁহাকে মাখাইয়া দিত। কেহ বা তাঁহার অঞ্চলে মুড়ি কিম্বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য বাঁধিয়া দিত। দয়াবতী ভগবতী দেবী তাহাদের যত্নে টাকা আদায়ের কথা ভুলিয়া যাইতেন। এবং গৃহে প্রত্যাগমনকালে তাহাদিগকে বলিয়া আসিতেন, "আজ তোরা আমাদের বাটীতে প্রসাদ পাস্"। এইরূপে

টাকা আদায়ের পরিবর্ত্তে গৃহে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া অবশেষে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইতেন। বাটীর সকলের আহার শেষ হইলে, যদি কোন অধমর্ণ আহার করিতে আসিত, ভগবতী দেবী তাহাকে দেখিবামাত্র জিব কাটিয়া বলিতেন, "তাই ত বাবা, আমার মনে ছিল না। একটু-খানি বস, আমি আবার ভাত রাঁধিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া দয়াশীলা ভগবতী দেবী তৎক্ষণাৎ আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

এক সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে কয়েকখানি লেপ প্রস্তুত করাইয়া দেশে পাঠাইয়া দেন। গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তি শীতে অতি কষ্টে নিশাযাপন করে শ্রবণ করিয়া ভগবতী ঐ লেপ কয়েক-খানি তাহাদিগকে দান করেন। পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন, "তুমি যে কয়েকখানি লেপ পাঠাইয়া দিয়াছ, তাহা গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিয়াছি। আমাদের জন্য কয়েকখানি কম্বল শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।" এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর বাটীর জন্য আবার কয়েকখানি লেপ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। এবং মাতাকে লিখিলেন, "ঐরূপ বিতরণের জন্য আপনার আর যে কয়েকখানি লেপের প্রয়োজন আমাকে সত্বর লিখিবেন, আমি এখান হইতে পাঠাইয়া দিব।" এইরূপে ভগবতী দেবীর দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তিনি পরের উপকারের জন্যই জন্মিয়াছিলেন, এবং পরের উপ-কার করিয়াই আপনার জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সরলতা ও পবিত্রতা।

যেখানে সরলতা সেইখানেই পবিত্রতা বিরাজ করে। কুটিলতা ও স্বার্থপরতা সরল ব্যক্তির হৃদয়কে কখন কলঙ্কিত করিতে পারে না। আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ প্রভেদ, সরলতা এবং কপটতায় সেইরূপ প্রভেদ। চন্দ্রের বিমল আলোকের ন্যায় সরলতা মানবচরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে। সরলতার সহিত সত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। বাস্তবিক সরলতা সত্যের ভিত্তিস্বরূপ। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ যখন বিশ্বাস করিলেন, ঈশ্বর এক এবং নিরাকার, তখন কার্য্যেও সেই মত প্রচার করিতে লাগিলেন, ইহাতে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুগণ তাঁহার প্রাণ-নাশ করিতে উদ্যত হইল, মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালাক এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হইয়া, একদিন মহম্মদকে বলিলেন, "মহম্মদ, আমি তোমাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করিয়া থাকি। কেহ যে তোমার মস্তকের এক গাছি কেশ উৎপাটন করে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব বৎস! ক্ষান্ত হও, এখন হইতে তোমার হৃদয়ের বিশ্বাস গোপন করিয়া লোকের মনের মত কার্য্য কর।"

আবুতালাকের এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহম্মদ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি স্নেহের বশীভূত হইয়া যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ কপটতা। বিশ্বাসকে বলিদান দিয়া, আমি কখনই কপটতাচরণ

করিতে পারিব না। যদি কেহ আমার এক হস্তে সূর্য্য ও অপর হস্তে চন্দ্র প্রদান করিতে পারে, তথাপি আমার বিশ্বাস বিনষ্ট করিতে পারিব না। অন্তরের বিশ্বাসমত কার্য্য করিব, ইহাতে জীবন যায়, তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।"

এক সময়ে খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক লুথারকে তাঁহার বন্ধুরা বলিয়াছিলেন, "লুথার! সাবধান হও, দেশমধ্যে অধিকাংশ লোকেই তোমার শত্রু; অতএব, যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, তবে ধর্ম্মসংস্কার ত্যাগ করিয়া, স্বীয় জীবন রক্ষা কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া লুথার গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "যাহা আমার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, আমি সরল মনে তাহাই প্রচার করিতেছি। আমি আমার কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করিতেছি, ইহাতে যদি এই মহানগরের যাবতীয় ইষ্টকরাশি আমার মস্তকে বর্ষিত হয়, তাহাতেও আমি কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিমুখ হইব না। আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, আমি সরলতা-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কখন কণ্টকাকীর্ণ কপটতা-পথে পদার্পণ করিব না।"

ফলতঃ সরলতা ও পবিত্রতা সাধু হৃদয়ের অলঙ্কার। যাঁহার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, তাঁহার অন্তর বিমল চন্দ্র কিরণের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ও আনন্দপূর্ণ। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত করিয়া চতুর্দ্দিক দিব্যালোকে আলোকিত করে, সরল ও পবিত্রহৃদয় সাধু মহাপুরুষগণও সেইরূপ পৃথিবীর পাপাচার বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের বিমল ও পবিত্র জ্যোতিতে বসুন্ধরাকে উদ্ভাসিত করেন। সরল হৃদয় মহাজন জগতের বিশ্বাস, ভক্তি ও সম্মানের পাত্র।

ভগবতী দেবী সরলতা ও পবিত্রতাগুণে ঐ প্রদেশের সকলেরই আন্ত-

রিক শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মনের বিশ্বাস মত কার্য্য করিতেন। অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ফলতঃ তিনি প্রাণান্তেও অন্তরে এক প্রকার এবং কার্য্যে অন্যপ্রকার ব্যবহার করিয়া লোকের নিকট ঘৃণিত হইতেন না। অথবা অন্যের মনস্তুষ্টির জন্য ভীত হইয়া, বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিয়া কপটতাচরণ করিতেন না। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন,প্রাণান্তেও কার্য্যকালে তাহার অন্যথাচরণ করিতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "সংসারের পথ অতি সরল, লোকে বুদ্ধির দোষে ইহাকে কুটিল করিয়া ফেলে। তুমি যাহা ফলভোগ কর, তাহার জন্য তুমিই দায়ী। তুমি দিবারাত্রি নিজে তোমার যত অনিষ্ট সাধন কর, আর কাহারও নিকট কখনও তত অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না।" আমরা এস্থলে ভগবতী দেবীর সরলতা, পবিত্রতা ও সাধুতা গুণের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

বীরসিংহ গ্রামে বাম্‌ণী পুষ্করিণী নামে এক জলাশয় আছে। একদিন ভগবতী দেবী তথায় স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানার্থ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের হস্তে একটী পুটিকা ছিল। ব্রাহ্মণ সেই পুটিকা হইতে একখানি শুষ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া পুটিকাটী পুষ্করিণীর ধারে একটী ঝোপের মধ্যে রাখিয়া স্নানার্থ পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন। স্নানান্তে ব্রাহ্মণ শুষ্ক বস্ত্র পরিধান ও গামছা দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। তিনি পুটিকার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ভগবতী দেবী স্নানান্তে উপরে উঠিলে, ঘটনাক্রমে পুটিকার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট

হইল। ভগবতী দেবী মনে করিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ভ্রমক্রমে ইহা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পুটিকা খুলিয়া দেখিলেন, কয়েকখানি নূতন বস্ত্র, কর্ণের দুইখানি স্বর্ণালঙ্কার ও চল্লিশটী মুদ্রা রহিয়াছে। ভগবতী দেবী মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি সমস্ত দিন সেই পুটিকাটী রক্ষা করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে শশব্যস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবতী দেবীকে দেখিয়া বলিলেন, "মা আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। রাত্রি প্রভাতে কন্যার বিবাহ। আমি মধ্যাহ্নে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। আমার নিকট একটী পুটিকা ছিল। ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা ঐ পুটিকাভ্যন্তরেই ছিল। মা, এখন আমার উপায় কি?" ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণকে প্রবোধ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুটিকাতে আপনার কি কি দ্রব্য ছিল?" ব্রাহ্মণ সত্য কথা বলিলেন।

ভগবতী দেবী বলিলেন, "আপনি যে কন্যাদায়গ্রস্ত তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। কারণ, তাহা না হইলে আপনার এতদূর চিত্তভ্রম ঘটিবে কেন? তৎপরে পুটিকাটী ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন আপনার সমস্ত দ্রব্য আছে কি না? আমি তদবধি এই পুটিকা রক্ষা করিয়া এইখানেই বসিয়া আছি। যাহা হউক আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।" ব্রাহ্মণ আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, "মা, তুমি আমার জাত কুল রক্ষা করিলে। মা, আমি এখনও জল গ্রহণ করি নাই। আমি অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যেন ধনে বংশে শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর।" ব্রাহ্মণ তখনও পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করেন.

নাই শুনিয়া ভগবতী দেবী পরম সমাদরে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিলেন। পরে ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে,তাহাতে আপনি কন্যাদায় হইতে কি মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না মা, আরও ১০।২০ টাকা প্রয়োজন। তখন ভগবতী দেবী বিংশতি মুদ্রা ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের এই কয়টী মুদ্রা দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন।" ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি দেবী, না মানবী! আমার ভ্রমই যে আমার পক্ষে পরম মঙ্গলজনক হইল। কারণ, আজ সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তির দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

একজন ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "লোকে সময়ের অভাব বলিয়া সতত আক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কার্য্যের তুলনায় এত অধিক সময় রহিয়াছে যে, তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাহারা হয় নিতান্ত অলসভাবে সময় নষ্ট করে, না হয় নিতান্ত উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। লোকে আপনাদিগের জীবিত কাল অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা সময়ের প্রতি এতদূর অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকে, যেন বোধ হয়, তাহাদের জীবিতকাল অনন্ত ও নিত্যস্থায়ী।"

দীর্ঘ জীবনাকাঙ্ক্ষা মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম। সকলেই দীর্ঘ জীবনের জন্য নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সময়ের যে সকল অংশের সমষ্টি দ্বারা জীবিতকাল পূর্ণ হয়, তৎসমুদয় ইহারা অতিশয় অবহেলার সহিত নষ্ট করিয়া ফেলে। পল, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি একত্র হইয়া দিন, মাস, বর্ষ, যুগ প্রভৃতি হয়, এবং এই দিন, মাস প্রভৃতির সমষ্টিই মনুষ্যের জীবিতকাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা পল, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতির অপব্যয় করে, তাহারা ক্রমে বর্ষ, যুগ প্রভৃতিরও অপ-

ব্যয়ের কারণ হয়, অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগের অমূল্য জীবন বৃথাই নষ্ট করে।

পথিক যেমন দেশপর্য্যটনকালে, বিশ্রামস্থান বা পান্থনিবাস পাইবার আশায়, জনপ্রাণিশূন্য প্রান্তর দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া যায়, মানবগণ সেইরূপ সুখ বা লাভের কামনায়, সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এবং পরিশেষে বর্ষ পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে বৃথা যাপন করে। জীবৎকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নষ্ট করিয়া দীর্ঘ জীবন কামনা করা এবং সময় হারাইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, উভয়ই তুল্যরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতার কার্য্য।

এই বিশ্বসংসারে মানবজাতির যত প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তন্মধ্যে নিঃস্বার্থ পরোপকাররূপ পুণ্যকার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবসমাজে এতাদৃশ পুণ্যব্রতের কিছুমাত্র অভাব নাই। অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, দরিদ্রের অভাববিমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, শোকার্ত্তের শোকাপনোদন, রুগ্নের শুশ্রূষা ইত্যাদি পবিত্র কর্ম্ম ভগবতী দেবীর জীবনে নিত্যই সংঘটিত হইত। পরস্পর-বিরুদ্ধ পক্ষের বিবাদভঞ্জনপূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ-স্থাপন, চরিত্রবান্ লোকের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, মাৎসর্য্যশালীর বিদ্বেষ-ভাব সংযমনের চেষ্টা, কোপন ব্যক্তির ক্রোধোপশমন, এবং কুসংস্কারাপন্ন লোকের মতসংশোধন ইত্যাদি নানাবিধ সৎকার্য্যে সময়ক্ষেপ করিয়া মনে মনে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিবার সুবিধা তাঁহার জীবনে প্রায় সর্ব্বদাই উপস্থিত হইত। এই সমস্ত সামাজিক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে যিনি কালযাপন করেন, তাঁহার সময় কি কখন অলসভাবে অতিবাহিত হইতে পারে?

ভগবতী দেবী অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। এবং কোন না কোন পারিবারিক সদনুষ্ঠানে দিবাভাগ অতিবাহিত হইত। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সকলকে সমভাবে পরিবেশন করিতেন। অতিথি, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। রজনীর দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি বিবিধ গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ক্ষেপণ করিতেন। অতঃপর আরও দুই ঘণ্টা একাকিনী বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেন। সুতরাং দিবাযামিনীর মধ্যে তিন ঘণ্টা মাত্র নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রামসুখ লাভ করিতেন।

সময়ের সদ্ব্যবহারার্থে অন্যবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম মানবজীবনে অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যখন আমরা সংসারের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থান করি, বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ক্ষণকালের জন্য অবসরগ্রহণ করি, যখন একাকী নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করি, তখন সেই পরম দেবতা, বিশ্ববিধাতা, অনাদি পুরুষের উপাসনায় নিযুক্ত হওয়া আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। স্রষ্টার আরাধনায় ক্ষণকাল ব্যাপৃত থাকা প্রত্যেক মানবেরই একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহার অর্চ্চনাব্যতীত সংসারের তাড়নায় ছিন্ন ভিন্ন ও দলিত হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে অভিলাষ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যিনি মঙ্গলময় বিশ্বপাতার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া, তৎসকাশে হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন, তিনি মনে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যখন তিনি ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার আত্মা ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় এবং যে মহতী শক্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার বিদ্যমানতার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তিনি সকল ভয়,ভাবনা, শোক,

দুঃখকেই রক্ষাকর্ত্তার চরণে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নির্ব্বিঘ্নে ও সুখশান্তিতে কালাতিপাত করিতে থাকেন। এই দুস্তর জীবন-সমুদ্রের প্রভঞ্জনোত্থিত ফেনিল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত কেবল গভীরতাবিহীন অসার সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা মৌক্তিকপ্রসূ শুক্তির ন্যায় তাহার তলদেশে বসিয়া স্বীয় হৃদয়োপরি পরম রমণীয় দুর্লভ মুক্তার নির্ম্মাণে সচেষ্ট, তাঁহাদিগকে সেই উর্ম্মিমালার ভীম প্রকম্পন স্পর্শও করিতে পারে না। জ্ঞানের গভীরতা, হৃদয়ের পূর্ণতা সমাজের ঘূর্ণাবর্ত্তে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব; তজ্জন্য নিস্তব্ধ শান্তি-আবাসে ধীর চিন্তাপ্রবাহের প্রয়োজন।

ভগবতী দেবী দিবাভাগের কিয়দংশ এবং সন্ধ্যার সময় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর গৃহস্থোচিত পূজা, সন্ধ্যা বন্দনাদিতে অতিবাহিত করিতেন। যখন তিনি সেবাধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি যেন আর ইহ-জগতের জীব নহেন। এই সময়ে তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। এবং যেন ভগবৎসেবা করিতেছেন এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি জীবসেবা করিতেন। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মনে হয়, দিবাযামিনীর অধিকাংশ সময় তিনি নির্জ্জনবাসজনিত শান্তি উপভোগ করিতে পারিতেন। তিনি এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই, অদ্যাপি বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দের নিকট তাঁহার নামোচ্চারণ করিবামাত্র, তাঁহারা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে আবেগময়ী ভাষায় তাঁহার অশেষ গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মহত্ত্ব ও মিতাচার।

কোন বিষয়েরই আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নহে। সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রাকৃতিক নিয়মের এক প্রধান লক্ষণ। সমঞ্জসীভূত উন্নতি সাধনই মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানবেত্তা অরিস্ততল মিতাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সকল বিষয়ের মধ্যম ভাবই ধর্ম্ম। ফলতঃ কি শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, কি ধর্ম্মোপার্জ্জন, কি খ্যাতিলাভ, কি ন্যায়ানুগত কর্ম্মবিধান, কোনও বিষয় মিতাচার ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না। যে ব্যক্তি মিতাচারী, তাঁহার ক্ষোভের কারণ অতি অল্প, তাঁহার হৃদয় প্রায়ই শান্তিরসাভিষিক্ত, তাঁহার মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, তাঁহার শরীর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম।

উচ্চাভিলাষ, মনস্বিতা, সাহস, শৌর্য্য, দয়া, প্রভৃতি মনের উচ্চভাব সকল মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যেখানে মহত্ত্বের উপাসনা, সেইখানেই প্রীতি ও ভক্তি বিরাজমান। এই প্রীতি ভক্তিই পরার্থে আত্মশাসন ও পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়। আবার মহত্ত্বের এই দুই মুল মন্ত্রের মুলেই মিতাচার বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মহত্ত্ব ও মিতাচার আপাততঃ পরস্পর বিভিন্ন বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও মুলে এতদুভয় বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ভগবতী

দেবীর জীবনে আমরা যে মহত্ত্বের পরিচয় পাই, তাহার মূলে কি পরিমাণে মিতাচার বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভগবতী দেবীর অন্নদান ব্যাপার তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখন ষোড়শোপচারে অন্ন-দানের ব্যবস্থা করিতে যত্নবতী হন নাই। তিনি যেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, দশজনকে ষোড়শোপচারে ভোজন করান অপেক্ষা, সেই ব্যয়ে বিংশতি জনকে অন্নদান করিতে পারিলে, অন্নদানের সদ্ব্যবহার হইবে। সুতরাং সামান্য গৃহস্থ গৃহে যেরূপ আহারাদির ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব, তিনি কখনই তদতিরিক্ত আয়োজন করিতে প্রয়াস পান নাই।

মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রায় শতাধিক লোক গৃহে ভোজন করিত। ইহা-দিগের আহার্য্য রন্ধন ও পরিবেশনাদি ব্যাপারে পাচকাদি নিয়োগ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারিণী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে যে অর্থব্যয় হইবে, তদ্দ্বারা তিনি আরও কয়েকজনকে অন্নদান করিতে পারিবেন। এইজন্য তিনি স্বয়ং রন্ধন ও পরিবেশনাদি করিতেন। পরিবারস্থ সকলে তাঁহার সাহায্য করিতেন মাত্র।

আপনার ও পরিবারস্থ জনগণের বিলাসিতা ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য অধিক ব্যয় করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি তদ্বিনিময়ে অপরের সুখবিধান করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি স্বয়ং চরকায় সূতা কাটিয়া তদ্দ্বারা মোটা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিবারস্থ সকলের পরিধানের নিমিত্ত দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন সময়ে

কলিকাতা হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র পাঠাইয়া দিলে, তিনি তাহা অপরকে বিতরণ করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি অলঙ্কারাদির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইবে, গৃহস্থালীতে তাহাদের আর সেরূপ মন থাকিবে না। বাটীতে দস্যু তস্করের ভয় হইবে। যে অর্থে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইব, সেই ব্যয়ে আমি দশজনকে অন্নদান করিতে পারিব।"

"দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তিসঞ্চয়ের বিরোধী, সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, এইজন্য তিনি অতি সামান্য দ্রব্যও সযত্নে রক্ষা করিতেন। গৃহসামগ্রী সকল বিশৃঙ্খল করিয়া রাখা সম্পত্তিরক্ষা ও সম্পত্তিবৃদ্ধির প্রতিকূল; গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরই ধনক্ষয় হয়, এইজন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে গৃহের যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন",—ভগবতী দেবীর পারিবারিক জীবনে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছিন্ন বস্ত্র, এক গাছি রজ্জু, ভগ্ন মৃন্ময় পাত্র, একগাছি তৃণ পর্য্যন্তও তিনি সযত্নে রক্ষা করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "যাকে রাখ সেই রাখে"। ফলতঃ মিতাচারের এই নীতিসূত্র আমরা প্রত্যেক মহতী নারীর জীবনেই দেখিতে পাই। পুণ্যবতী, করুণার মূর্ত্তি, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনেও আমরা এই নীতিসূত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সামান্য দ্রব্যটী পর্য্যন্ত মহারাণী অতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেন। তাঁহার নিকট নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার উপহার প্রেরিত হইত। ঐ সকল উপহার উৎকৃষ্ট ফিতা বা সূতা দ্বারা বাঁধা থাকিত। মহারাণী ঐ সকল ফিতা ও সূতা যত্ন

করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর ঐ সকল সূতা ও ফিতার মূল্য ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। যাঁহার রাজ্যে কখন সূর্য্যাস্ত হয় না, সেই প্রবল প্রতাপান্বিতা, ইংলণ্ডের সৌভাগ্যলক্ষ্মী, রাজরাজেশ্বরী, পুণ্যশীলা ভিক্টোরিয়া যখন মিতাচারিণী ছিলেন, তখন আমাদের সামান্য গৃহস্থ গৃহে কিরূপ মিতাচার অবলম্বনের প্রয়োজন, পাঠকগণ, একবার ধীরচিত্তে এ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিবেন।

যে সকল বালক গৃহে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্রে পরিত্যক্ত থাকিত। ভগবতী দেবী কন্যাদিগকে সেই সকল উচ্ছিষ্ট অন্ন যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে বলিতেন। এবং পরিশেষে তিনি পরম সন্তোষপূর্ব্বক সেই সকল অন্ন ভোজন করিতেন। এইরূপে অনেকদিন ঐ উচ্ছিষ্ট অন্ন দ্বারাই তাঁহার উদরপূর্ত্তি হইত। তাঁহার দেবী চরিত্রের আখ্যায়িকা যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁহার পরার্থে আত্মশাসন ও পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জনের মূলে মিতাচারই বিদ্যমান ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্তানবাৎসল্য।

ভগবতী দেবীর ন্যায় উন্নতহৃদয়া, উদারপ্রকৃতি গুণবতী রমণী সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন মা না হইলে কি বিদ্যাসাগরের ন্যায় পুত্র জন্মে? মাতার সেই উন্নত হৃদয়ভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত পুত্রও অতি বিরল। বৃদ্ধ বয়সেও মাতার নাম করিলে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইত। কেহ তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়া যদি বলিত, 'আমার মা নাই', তাহা হইলে অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইত। 'মা' নাম শ্রবণ করিলে বিদ্যাসাগর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইতেন। 'মা' নামই যেন তাঁহার জীবনের সাধন মন্ত্র ছিল। তিনি সঙ্গীতবিদ্যা জানিতেন না। কিন্তু যে সঙ্গীতে 'মা' নাম আছে,সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। 'মা' নাম পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের ভক্তিরস উদ্বেল হইয়া উঠিত। গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইত। এই মাতাপিতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রই একদিন কাশীধামের ব্রাহ্মণদিগকে মাতাপিতার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা কি তাহা আমি জানি না। আমার বিশ্বেশ্বর এই—আর আমার অন্নপূর্ণা এই। বিদ্যাসাগর আজীবন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া মাতাপিতার প্রতিকৃতি প্রণাম না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপ-

লক্ষ্যে বাটী যাইবার জন্য তাঁহার প্রতি জননীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল। সেই সময়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম করিতেন। মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তিনি উপরিতন কর্ম্মচারী মার্সেল সাহেবের নিকট ছুটির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ছুটি পাইলেন না। ছুটি না পাইলে, মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে; এই দুঃখে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। পরে মাতার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, পদত্যাগপত্র হস্তে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেব তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ছুটি দিতে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ছুটি পাইয়া তদ্দণ্ডেই ভৃত্য সমভিব্যাহারে বিদ্যাসাগর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে ঘোর বর্ষাকাল। আকাশ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, সম্মুখে উচ্ছলিত ভয়াবহ দামোদর নদ, পারের কোন উপায় নাই। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র, জননীর চরণ স্মরণ করিয়া সেই প্রবল স্রোতোমালাবিশিষ্ট ভয়াবহ দামোদর নদ সন্তরণপূর্ব্বক পার হইলেন। পথে তাঁহাকে দারুকেশ্বর নদও এইরূপে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এবং আর্দ্রবস্ত্রে দৌড়িতে দৌড়িতে বাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ভ্রাতা বিবাহ করিতে গিয়াছেন; তিনি বাটী যান নাই বলিয়া মাতৃদেবী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। গৃহপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসলা জননী তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র শশব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। মাতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে তদবস্থ দেখিয়া এক সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। সে রোদনের আর নিবৃত্তি নাই! কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব সম্মিলন!

বহুতর বিদেশীয় মাতৃভক্ত মহাপুরুষের কথা শুনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সহিত মাতৃভক্ত বীর বিদ্যাসাগরের তুলনা সম্ভবে কি? ইতিহাসে উল্লেখ আছে, রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি এবং সম্রাট জুলিয়াস্ সীজর যখন ইংলণ্ড বিজয়মানসে সাগর পার হইবার জন্য অর্ণবপোতে সসৈন্যে আরোহণ করেন, তখন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছিল। প্রবল বাত্যাবিক্ষোভিত সিন্ধুর প্রলয় মূর্ত্তি দর্শনে নাবিকগণ ভীত হইলে, সীজর সদর্পে বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই, এ তরি সীজরের সৌভাগ্য বহন করিতেছে।" পাঠকগণ! স্থিরচিত্তে প্রনিধান করুন এই দুই বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? একপক্ষে ভাবী বিজয়দৃপ্ত হৃদয়ের দুঃসাহসিকতা,—অপর পক্ষে মাতৃভক্ত বীরের মাতৃপূজার জন্য আত্মবলিদান! কোন্ বীর পূজার যোগ্য? কোন্ বীর প্রশংসনীয়? কোন্ বীর প্রাতঃস্মরণীয়?

পাঠকগণ! ধর্ম্মজগতে এইরূপ ব্যাপারই একদিন সংঘটিত হইয়াছিল বটে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণজন্য হরিবিদ্বেষী দুর্ব্বৃত্ত কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করিলে, পিতা বসুদেব যখন পাপাত্মার হস্ত হইতে সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য সেই সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া পলায়ন সময়ে কালিন্দী তটে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহারও এই অবস্থা! চতুর্দ্দিক ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন—মুহুর্ম্মুহু মেঘগর্জ্জন—মূষলধারে বারিবর্ষণ—কালিন্দীর প্রবল জলোচ্ছ্বাস! পুত্রবৎসল পিতা পরপারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে কালিন্দীর প্রবল জলস্রোতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ঝাঁপ দিলেন। প্রেমভক্তির পরীক্ষার শেষ হইল! বসুদেব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আধ্যাত্মিক জগতে উভয় ব্যাপারই একরূপ! একপক্ষে প্রেমের পরীক্ষা!—অপর পক্ষে ভক্তির পরীক্ষা! কিন্তু ভক্তি, প্রেম,

প্রণয়, স্নেহাদি সকলই সেই এক অনুরাগ মহোদধিরই ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ মাত্র! সেইজন্য মনে হয়, ইহা দামোদরের জলোচ্ছ্বাস নহে!—ইহা সেই দেবনদী কালিন্দীরই জলোচ্ছ্বাস! ইহা জলোচ্ছ্বাস নহে!—ইহা প্রেম-ভক্তির কঠোর পরীক্ষা! মাতৃভক্ত বীর বিদ্যাসাগর কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মাতৃপদ স্মরণ করিতে করিতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যখন ঝাঁপ দিলেন, তখনই মাতৃরূপিণী আদ্যাশক্তি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ভক্ত জীবনের পরীক্ষাই এইরূপ! সৃষ্টির বিনাশ আছে—কিন্তু ভক্তের বিনাশ নাই! ভক্তের রক্ষার জন্য ভগবানের সুকোমল পবিত্র হস্ত সর্ব্বস্থানে সতত প্রসারিত! ভক্ত,—অক্ষয়—অব্যয়—অবিনশ্বর!

পাঠকগণ! একবার হৃদয়ে উপলব্ধি করুন, স্নেহ ভক্তির কিরূপ সন্নি-পাতে, কিরূপ বিনিময়ে এরূপ মাতৃভক্ত বীর সন্তানের সৃষ্টি হইতে পারে! ধন্য সন্তানবাৎসল্য! ভগবতী দেবী, তোমার সমস্তই বিচিত্র! তোমার তুলনা একমাত্র তোমাতেই সম্ভবে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নৈতিক বাধ্যতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তঃকরণ স্বতঃই হিন্দু বালবিধবাদিগের দুঃখে বিগলিত হইত। কোন বালিকা বিধবা হইয়াছে শ্রবণ করিলে, বিদ্যাসাগর হৃদয়ের আবেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেন না, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিধবা-বিবাহপ্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কালসহকারে বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন, শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত বিধবাবিবাহ প্রচলন করা দুরূহ। সুতরাং তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করা বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য হইলেও প্রথমতঃ তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণসংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরে একদিন রজনী যোগে একখানি পুঁথি পাঠ করিতে করিতে তিনি হঠাৎ আনন্দবেগে উঠিয়া বলিলেন,—"পাইয়াছি, পাইয়াছি।" উপস্থিত সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পাইয়াছেন ? তখন তিনি পরাশরসংহিতার সেই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন :—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধিয়তে।"

এইরূপে তিনি যখন মনে ও জ্ঞানে স্থির করিলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত, তখন তিনি ঐ প্রথা প্রচলন জন্য মন,প্রাণ,ধন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি-

লেন। তৎপরে মাতাপিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য দেশে গমন করিলেন। ভগবতী দেবীর নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, "বাবা, তুমি কি আমার যে সে ছেলে? তুমি যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত স্থির করিয়াছ, তখন আমি প্রসন্নমনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আহা! যদি জন্মদুঃখিনীদের কোন গতি করিতে পার, তাহা বাবা এখনই কর। কিন্তু বাবা, একবার কাজে হাত দিলে,তখন সমাজের ভয়ে, এমন কি আমি কি কর্ত্তা বারণ করিলেও তুমি কোন মতে নিবৃত্ত হইবে না।"

তৎপরে বিদ্যাসাগর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি ঐরূপ উত্তরই দিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, "কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তুমি আর একবার উত্তমরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি দেখিবে।"

মাতাপিতৃভক্ত সন্তান বিদ্যাসাগর মাতাপিতার আদেশ স্বীয় জীবনাপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। দশের সমষ্ট লইয়া সমাজ, দশের কল্যাণের জন্য সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু বলি দিতে উপদেশ দেওয়া জগতে এক বিচিত্র ব্যাপার! ধন্য ভগবতী দেবী! ধন্য তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি! ধন্য তোমার কর্ত্তব্যশিক্ষা! একে বালবিধবাদিগের দুঃখে বিদ্যাসাগরের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছিল, সেই দগ্ধহৃদয়ে মাতাপিতার আশীর্ব্বাদরূপ পূর্ণাহুতি প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর কর্ত্তব্যবুদ্ধিরূপ অযুধে সন্নদ্ধ হইয়া অপ্রতিহত গতিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, জগৎ তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ফলতঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধির কি মহীয়সী শক্তি! যে কর্ত্তব্যজ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া

মহাজ্ঞানী সক্রেটিস তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"ক্রিটো! আমি সর্ব্বজনাধিগত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থ কোথায় গমন করিব?" যে নৈতিক বাধ্যতা প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মবীর ঈশা অসহ্য ক্রুশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন; মহাত্মা সেণ্টপল রোমনগরস্থ কারাগৃহে সিংহ মুখে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য নির্ভীক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন; বীর-হৃদয় মার্টিন লুথার পোপের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন; ধর্ম্মবীর পার্কার মার্কিণ দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে এবং কাফ্রি-দাসদিগের দাসত্বশৃঙ্খল মুক্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; চিরস্মরণীয় গ্যালিলিও আপনার বিচারকদিগের সম্মুখে রক্ত মাংসের দুর্ব্বলতা বশতঃ স্বীয় আবিষ্কৃত সত্যকে অস্বীকার করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পৃথ্বীতলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "ইহা এখনও চলিতেছে! যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নানক পঞ্জাবে একে-শ্বরবাদ প্রচার করিতে গিয়া কোন প্রকার বাধাবিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে ইষ্টক বৃষ্টির মধ্য দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন: রাজা রামমোহন রায় প্রাণহানির সম্ভাবনা সত্ত্বেও অকুণ্ঠিতচিত্তে উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনার্থ যে মন, প্রাণ, ধন, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? বিধবাবিবাহ ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, আত্মোৎসর্গ, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও বিশাল করুণ হৃদয়ের জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া কেহই নিরস্ত থাকিতে পারেন না। বিধবাদিগের বিবাহ দিতে প্রচুর ব্যয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। প্যারিচরণ সরকার প্রমুখ কতিপয় দেশবিখ্যাত

ব্যক্তি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতসারে, তাঁহার ঋণজাল মোচনের জন্য, চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ইহা জানিতে পারিয়া, বলিলেন, "আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব, তাহার জন্য অন্য কাহাকেও দায়ী করিতে চাহি না।"

এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি সেই সকল নির্য্যাতন ধীর ভাবেই সহ্য করিয়াছিলেন। শিষ্টসমাজের বিরাগ বহন করা দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ কঠিন নহে। কারণ, উহাদিগের ক্রোধও কখন বিবেক বা ব্যবহার মর্য্যাদা অতিক্রম করে না; এবং দেশকালপাত্র বিবেচনায়, অন্যের উপর রোষপ্রকাশ করিতেও ভীত হয়। কিন্তু যখন শিষ্টজনের এই ভীরু কোপানলে, ইতর লোকের রোষোচ্ছ্বাস আসিয়া সম্মিলিত হয়, যখন মূর্খ ও ইতরজনের ক্রোধবহ্নি উদ্দীপিত হয়, এবং সমাজতলস্থ অজ্ঞানান্ধ পশুপ্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া ভীষণ গম্ভীরনাদ করিতে থাকে, তখন কেবল মহৎ ঔদার্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতাই, দেবতার ন্যায়, উহার প্রতি অব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, এবং উহাকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা সাধুজীবনের বিশেষ লক্ষণ। এই দুইটী সদ্গুণে লোকের চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। অপরে যখন আমাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন করে, অথবা আমাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিবার প্রয়াস পায়, তখন বৈর-নির্য্যাতন-বাসনায় হৃদয় কলুষিত করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। যাহারা সহিষ্ণুতা শূন্য হইয়া ক্রোধে উত্তেজিত হয়, সেই আত্ম-সংযম-শক্তিবিরহিত ব্যক্তি-বর্গের প্রকৃতি অতিশয় ঘৃণার্হ। আত্মসংযম-ক্ষমতাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। কেহ আমাদিগের অপবাদ ঘোষণা করিলে, সাধারণতঃ তাহার প্রতি আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকি,কেহ আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে,তাহার বিপৎকালে আমরা আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু এই সকল ব্যাপার, আমাদিগের লঘুচিত্ততারই সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে। সামান্য বায়ু ভরে তৃণই বিচলিত হয়; ভয়ঙ্কর ঝটিকার সময়েও অচলরাজি স্থানচ্যুত হয় না; সামান্য কারণেই লঘু হৃদয় বিচলিত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে, কিন্তু মহৎ হৃদয় কিছুতেই ক্রোধ বা বৈরনির্য্যাতন-বাসনা দ্বারা চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে না।

যাহারা ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া, অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা দণ্ড প্রদান করিবার প্রকৃত অধিকারী নহে; কিন্তু প্রশান্ত

হৃদয়ে অপরাধীর কল্যাণসাধনকামনায় যাঁহারা দণ্ডবিধান করিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল শাসন ও দণ্ডবিধানের অধিকারী। যে সকল ব্যক্তি ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু নহে, অপরকে শাসন করিবার অধিকার গ্রহণ করা তাহাদিগের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কি? মানবমাত্রেরই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। ক্ষমাতে একদিকে যেমন হৃদয়ের উদারতা প্রকাশিত হয়, অপরদিকে তেমনই দয়া ও লোকানুরাগ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমরা যদি ক্রমাগত আমাদিগের শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে কোন না কোন দিন তাহাদিগের হৃদয় অনুরাগে আর্দ্র হইয়া পড়িবে। শত্রুবিজয়ের এরূপ সহজ ও সুন্দর পন্থা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিধবাবিবাহবিষয়ে গ্রামবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই ঠাকুরদাসের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন প্রাতে উঠিয়া ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেখিতে পাইলেন, রজনীযোগে বিরুদ্ধবাদীরা কণ্টকবৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্তূপাকার করিয়া তাঁহাদের দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে ঠাকুরদাস ও ভগবতী গমনাগমনের জন্য নীরবে পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। একদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন, বিপক্ষ দলের লোকেরা কতকগুলি মৃত জীব জন্তু তাঁহাদের দ্বারদেশে নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছে। ঠাকুরদাস সেই সময়ে একখানি গৃহ নির্ম্মাণের আয়োজন করিতেছিলেন। একদিন রজনীতে সুযোগক্রমে শত্রুপক্ষীয়েরা সেই গৃহের সমস্ত উপাদান অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এইরূপে ঠাকুরদাস ও ভগবতী তাহাদিগের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই সংবাদ বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের শ্বশুর, ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি একদিন বীরসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য অতিশয় তেজস্বী, ক্রোধী ও বলশালী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার স্বীয় গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাঁহার বলবত্তার তুলনা ছিল না। অথচ তিনি সহৃদয়তা ও উদারতা গুণে সর্ব্বজনের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভয়ে তৎকালে ঐ প্রদেশের দস্যু তস্করেরা সতত শঙ্কিত থাকিত। সেই সময়ে ঐ প্রদেশের কোন বলশালী সদ্গোপ—এক দস্যুদল গঠন করিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে লোকে সদা ভয়ে দিন যাপন করিত। একদিন শত্রুঘ্ন, জ্যেষ্ঠের অনুরোধে একাকী সেই দস্যুদলকে এমন শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে তদবধি তাহারা আর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিত না। তাঁহার দৈহিক বলের জন্য ঐ প্রদেশের সকলে তাঁহাকে 'কলির ভীম' বলিত।

পরদিবস ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরুদ্ধবাদীদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, যদি সকলে প্রাণের মায়া মমতা রাখ, তবে নিরস্ত হও। বৈবাহিক মহাশয় অতিশয় নিরীহ ও সদাশয় ব্যক্তি। ইহার দ্বারা তোমাদের কখনও কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। ইনি সতত তোমাদের মঙ্গলচিন্তায় নিরত। ঈদৃশ হিতাকাঙ্খী নিরীহ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অতীব গর্হিত কার্য্য। তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, অতঃপর আর ইহার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিও না। আর যাবৎ ইহার গৃহ নির্ম্মাণ না হয়, তাবৎ আমি বীরসিংহে অবস্থিতি করিব। আমার বল বিক্রমের কথা তোমাদের অবিদিত নাই। আমি

স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যদি শুনিতে পাই যে, তোমরা পুনরায় ইহার উপর কোন অত্যাচার করিয়াছ, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিব, যে সকলে বীরসিংহের পৈতৃক বাস্তু ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে।" যাহা হউক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তেজ ও সহৃদয়তা মিশ্রিত উক্তি শ্রবণে অতঃপর বিরুদ্ধবাদীরা ঠাকুরদাসের উপর অত্যাচার করিতে নিরস্ত হইয়াছিল।

সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল অত্যাচারের কথা তাঁহার কর্ণগোচর করেন। ঘোষাল মহাশয় মফঃস্বল ভ্রমণ কালে একদিন ছদ্মবেশে বীরসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরদাস পরম সমাদরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। শেষে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়াছি কেন কিছু কি জানিতে পারিয়াছেন?" ঠাকুরদাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না, আমিত তাহার কিছুই জানি না।" তখন ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, বিধবাবিবাহসম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীরা আপনার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে! আপনি তাহাদের নাম বলুন। আমি শাসনের ব্যবস্থা করিব।" ঠাকুরদাস বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "ঈশ্বর ছেলে মানুষ, সে বিদেশে থাকে, দেশের কোন সংবাদ রাখে না। কাহার মুখে কি শুনিয়াছে, তাহাই আপনাকে বলিয়াছে। গ্রামের কাহারও সহিত আমার অসদ্ভাব নাই। তাহার কথা শুনিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে শাসন করা আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।" ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সমস্তই বুঝিলাম। আপনার ন্যায় পিতার ঔরসে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই—বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর হইতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, গ্রামবাসী সকলে আপনার সহিত সদ্ভাবে আছে, তাহা হইলে আমি আর তাহাদের উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করিব না।"

অতঃপর ঠাকুরদাস দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভগবতী দেবীকে বলিলেন, "মনসা, গ্রামের লোকেরা আমাদের উপরে অত্যাচার করে, হাকিম কাহার নিকট শুনিতে পাইয়াছেন।" ভগবতী দেবী এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন, "তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি। আহা! এখন লোকগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? হাকিম যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন ত আর উহাদের নিস্তার নাই। উহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইবে। উহারা যেন না বুঝিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করে, কিন্তু আমরা উহাদের উপর অত্যাচার কিরূপ করিয়া দেখিব? এখন উপায় কি? তুমি হাকিমকে কি বলিলে?" তদুত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, "মনসা, আমি হাকিমকে বুঝাইয়া দিয়াছি, গ্রামবাসী সকলের সহিত আমার সদ্ভাব আছে। এখন তুমি তাহাদিগের সকলকে একবার সাবধান করিয়া দিয়া আইস, তাহারা যেন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাটীতে আসিয়া হাকিমের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যায়।"

ভগবতী দেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রত্যেকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, হাকিম তোমাদের অত্যাচারের কথা কাহার নিকট শুনিয়া তদন্ত করিতে আসিয়াছেন। আমাদের নিকট তোমাদের নাম চাহিয়াছিল, কিন্তু আমরা দিই নাই।

আমরা বলিয়াছি, গ্রামের সকল লোকই আমাদের সঙ্গে সদ্ভাবে আছে। তোমরা সকলে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাটীতে গিয়া হাকিমের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেই সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। আর তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ রহিল। রাত্রিতে সকলে আমাদের বাটীতে ভোজন করিবে।" গ্রামবাসীরা ভগবতীর উপদেশমত কার্য্য করিয়া ঘোষাল মহাশয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অতি দুর্লভ!

ফলতঃ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীরা খড়্গহস্ত হইয়া ঠাকুরদাসের উপর এরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল যে, সে সকল অত্যাচারে পর্ব্বতও বিচলিত হয়, হিমশিলাও অগ্নিময় হয়। কিন্তু তিনি ও ভগবতী দেবী সেই সকল অত্যাচার যে ভাবে সহ্য করিয়াছিলেন এবং অত্যাচারীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে মনে হয়, দ্বিতীয় যীশু খ্রীষ্ট বা হরিদাস, ঠাকুরদাস ও ভগবতীরূপ যুগল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বীরসিংহে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জীবসেবা ও বিশ্বপ্রেম।

প্রেমের প্রতাপ মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্বত্রই সমান দুর্দ্ধর্ষ। প্রেমের সঞ্চার হইবামাত্র মনোভাব প্রশস্ত হয়। অশান্ত প্রকৃতিও মৃদুভাব ধারণ করে এবং হীনমনা কাপুরুষও সাহসিকতা প্রাপ্ত হয়। অতি নীচ জঘন্য হৃদয়মধ্যেও শৌর্য্যাদি বীরগুণের এত প্রভূত সমাবেশ হইয়া থাকে যে, তদ্দ্বারা প্রিয়জনের হিতসাধন ও সুখবিধানের আশা জন্মিলে সে সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিয়া চলিতেও ভীত হয় না। প্রেমের প্রভাবে মানব যেন সম্যক্ রূপান্তরিত হইয়া অভিনব জীবন লাভ করে। তাহার ইন্দ্রিয়গণের নূতন শক্তির বিকাশ হয়। হৃদয়মধ্যে নবীন বাসনা প্রবলতর বেগে উদিত হয়; এবং ধর্ম্মের পবিত্র ভাব আসিয়া প্রবেশ করে। সে তখন কোন পরিবার বা সমাজের অন্তর্গত থাকে না। তখন তাহার স্বকীয় সত্ত্বত্তা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। বিশিষ্ট গুণসমূহের প্রতিকৃতিস্বরূপ সে তখন জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। এবং আত্মার সতেজকণ্ঠই সত্যের ধ্রুবস্বর মনে করিয়া পৃথিবীস্থ জীবসমূহের কল্যাণসাধনে আত্মসমর্পণ করে। এইখানেই বিশ্বপ্রেমের পরিচয়। এবং এইরূপে জীবসমূহের কল্যাণসাধনের নামই সেবাধর্ম্ম।

চৈতন্যদেব সনাতন প্রভুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

"জীবে দয়া নামে রুচি সাধুর সেবন।
এই তিন ধর্ম্ম ভিন্ন নাহি সনাতন ॥"

উপনিষৎকারও কহিয়াছেন :—

"এতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।"

দম, দান ও দয়া এই তিন যত্নতঃ শিক্ষা করিবে। চৈতন্যপ্রভু যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই উপনিষৎকারেরও অনুশাসন। ফলতঃ জীবে দয়া, নামে রুচি ও সাধুসেবা বিশ্বপ্রেমেরই উপাদান।

মনুষ্যের নিজ আত্মার সমান প্রিয় বস্তু সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। স্ত্রী, পুত্র, ধন, বন্ধু প্রভৃতি সমুদয়ই আত্মার প্রীতির জন্য। সুতরাং 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' মানবের যখন এই জ্ঞান হয়, তখন মানব সর্ব্বভূতের কল্যাণ, আত্মকল্যাণ বলিয়া মনে করে এবং সর্ব্বভূতের সুখসাধন করিয়া আত্মসুখ লাভ করে। এই অবস্থায় মানবহৃদয়ে সেবাধর্ম্ম জাগিয়া উঠে। পাঠকগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে ভগবতী দেবীর সেবাধর্ম্ম ও বিশ্বপ্রেমের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে আপনাদিগের অবগতির জন্য আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার সময় বাটীর কোন অভিভাবককে সঙ্গে না লইয়া একাকী কখনই আসিতেন না। তিনি সচরাচর পিতামহ ঠাকুরদাসের সহিত আসিতেন। কখন কখন পিতামহীর সহিত আসিতেন, একবার পিতামহী ভগবতী দেবীর সহিত তিনি কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তৎকালে বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিবার পথ সুগম ছিল না।

পিতামহীর সহিত আসিবার সময়ে তাঁহারা কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিলেন যে জনৈক গৃহস্থের গৃহ হইতে হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া দয়া ও করুণার মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি ভগবতী দেবী পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, "দাঁড়াত ; এ বাড়ীতে কেন কাঁদিতেছে একবার শুনিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া ভগবতী দেবী বালক নারায়ণচন্দ্রকে তথায় সাবধানে থাকিতে বলিয়া সেই গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বালক নারায়ণচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ তাঁহার অপেক্ষায় সেই পথের ধারে বসিয়া রহিলেন। পিতামহীর বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিতামহী সেই অপরিচিত গৃহস্থের ক্রন্দনে যোগ দিয়াছেন। পৌত্র নারায়ণচন্দ্রকে যে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের সহিত কাঁদিতে বসিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ধন্য বিশ্বপ্রেম! তুমিই মানুষকে আত্মহারা করিয়া পরসেবায় নিয়োজিত করিতে পার! তোমার অসীম প্রভাব!

এই প্রকার অপরিমেয় সেবাগুণেই তিনি বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের আপামর সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পরের বিপদকে আপনারই বিপদ বলিয়া মনে করিতেন। কেহ বিপদাপন্ন হইয়াছে, ইহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে উপস্থিত হইতেন এবং তাহার বিপন্মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রোগার্ত্তের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তিনি জননীর ন্যায় তাহার শুশ্রূষা করিতেন। রোগীর মলমূত্র তিনি চন্দনবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি স্বহস্তে তাহা মুক্ত করিতেন,তাঁহার মনে কিছুমাত্র ঘৃণার উদ্রেক হইত না।

রুগ্নের শুশ্রূষায় তাঁহার আত্মপর বা ইতর ভদ্র ভেদ ছিল না। হাড়ি, ডোম,তেওর,বাগ্দী প্রভৃতি কিছুই বিচার ছিল না। কেহ পীড়িত হইয়াছে কর্ণগোচর হইলেই তাহার শয্যাপার্শ্বে তিনি সমাসীন হইতেন। তিনি কাহারও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, কাহারও পথ্য রন্ধন করিয়া দিতেছেন, কাহারও বা অন্যবিধ শুশ্রূষা করিতেছেন, এইরূপে রুগ্নের পার্শ্বে তিনি মাতৃমূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিয়া সতত তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেন। কোন বালিকা বিধবা হইয়াছে বা কাহারও পুত্রবিয়োগ ঘটিয়াছে শ্রবণমাত্রই তিনি সেই শোকার্ত্ত পরিবারের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শোকে এতদূর অধীর হইয়া পড়িতেন যে, ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতে থাকিতেন। একসময়ে কোন প্রতিবেশীর একমাত্র পুত্র কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়। ভগবতী দেবী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেই বালকের শুশ্রূষায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে একাদিক্রমে তিনি ১০।১২ দিন রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন ইহাতে কিছুমাত্র তাঁহার ক্লেশানুভব হয় নাই। পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়েই সেই বালকের মৃত্যু হয়। তখন তিনি পুত্রশোকাতুরা মাতার ন্যায় সেই মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় যেরূপ করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। পুত্রশোকাতুরা জননীর নিকট হইতে সন্তানের মৃতদেহ গ্রহণ করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাঁহার নিকট হইতে সেই বালকের মৃতদেহ গ্রহণ করা ততোধিক দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। এরূপ দ্রবীণহৃদয়,—এরূপ সমবেদনা,—এরূপ লোকসেবা—প্রকৃতপক্ষেই ইহজগতে এক বিচিত্র ব্যাপার। জীবসেবাই যেন তিনি শিবসেবা মনে করিতেন।

লোকসেবায় তাঁহার ভগবৎসেবায়ই যেন প্রতীতি জন্মিত। ধন্য ভগবতী দেবী! তোমার সমস্তই বিচিত্র লীলা!

পথিপার্শ্বে কোন জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিলে, অশ্রুধারায় ভগবতী দেবীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইত। গৃহপালিত কোন জীবজন্তু যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাইলেই তিনি তাহার শুশ্রূষায় নিরত হইতেন। তিনি যখন শেষবার কাশীযাত্রা করেন, তথায় এক অশীতিপর বৃদ্ধা পীড়িতা হইয়াছেন এবং তাঁহার শুশ্রূষার কেহ নাই শ্রবণমাত্র ভগবতী দেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত হইলেন। তিনি স্বহস্তে ঐ বৃদ্ধার মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন দেখিয়া বৃদ্ধা লজ্জিত হইতেছেন বুঝিতে পারিয়া ভগবতী দেবী বলিলেন, "আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আপনি আতুর, আপনার সেবা আর স্বয়ং অন্নপূর্ণার সেবায় প্রভেদ কি? ইহা ত মলমূত্র নহে, ইহা চন্দন! আমার মনে বিন্দুমাত্র ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই।" বৃদ্ধা ভগবতী দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলের আশীর্ব্বাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পরে বৃদ্ধা সুস্থ হইলে,ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরকে বলিয়া তাঁহার ও অপর আরও দুই একটী বৃদ্ধার মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

বধূ ও কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে,ভগবতী দেবী অধিকাংশ সময় লোকসেবায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি দিবাভাগের সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া প্রতিদিন বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেন। কাহারও মুখ বিষণ্ণ দেখিলে, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত! অপাঙ্গ ভেদ করিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার মুখ শুষ্ক কেন?

তোমার কি খাওয়া হয় নাই ? তোমার কি অর্থকষ্ট হইয়াছে ?” এইরূপে তিনি গৃহে গৃহে সকলের অভাব জানিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতেন। ইহাই তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল।

ভগবতী দেবী শেষবার যখন কাশীধামে গমন করেন, তখন তাঁহার মাসাধিক তথায় অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ শোকাকুল হইয়াছিলেন। তিনি দুঃস্থ লোকদিগের মাসাধিকের জন্য সমস্ত দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যখন কাশীধামে যাত্রা করিলেন, তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা এমন কি গৃহস্থের কুলবধূগণ পর্য্যন্তও কিরূপ ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বীরসিংহের উপকণ্ঠস্থিত প্রান্তর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রেমের প্রতিদান এই বিশ্বেই রহিয়াছে! যিনি জগতের জন্য ক্রন্দন করেন, জগৎও তাঁহার জন্য ক্রন্দন করে! তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না!

সত্য সত্যই ভগবতী মা আনন্দময়ীরূপে বীরসিংহে বিরাজমান ছিলেন। লোকের মুখ শুষ্ক দেখিলে, তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। নিরানন্দের ছায়া বিশ্ব হইতে বিলুপ্ত হউক! বিশ্ব আনন্দে ভাসমান হউক!—বিশ্ব হাস্যে উদ্ভাসিত হউক!—এ আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমাতার হৃদয়েই সম্ভবে! ধন্য ভগবতী দেবী! ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম!—ধন্য তোমার জীবসেবা!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চরিত্রমাহাত্ম্য।

চরিত্রই মানব জীবনের মুকুটস্বরূপ। বিদ্যাবল ও ধনবল অপেক্ষা চরিত্রবলই শ্রেষ্ঠ। চরিত্রবান্ ব্যক্তি নীচকুলোদ্ভব হইলেও চরিত্রগুণে উচ্চকুলমর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সম্পদ্‌বিহীন হইলেও লোকানুরাগরূপ অপার্থিব সম্পত্তি লাভ তাঁহারই ভাগ্যে ঘটে। ধন, মান অপেক্ষা চরিত্রের প্রাধান্যই অধিক।

লোকের প্রবৃত্তি, সংসর্গ ও ব্যবহার আলোচনা করিলে তাহার চরিত্র নির্ণীত হয়। কোন্ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, তাহা জানিতে হইলে তাহার কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান প্রয়োজন। জনসমাজে উন্নতি লাভের যত উপায় আছে, বা থাকিতে পারে, চরিত্রবলই তন্মধ্যে প্রধান।

জ্ঞানই বল, ইহা চিরন্তন সত্য। কিন্তু জ্ঞানবল অপেক্ষা চরিত্রবলই শ্রেষ্ঠ। যাহার হৃদয় আছে, অথচ সহৃদয়তা নাই; প্রতিভা আছে, সরলতা নাই; কার্য্যনৈপুণ্য আছে অথচ সাধুতা নাই; তাহার ঈদৃশ হৃদয়, প্রতিভা ও কার্য্যনিপুণতা দ্বারা জনসমাজের কি ইষ্ট সাধিত হইতে পারে? যাঁহার চিত্তে সরলতা, ধর্ম্মে অনুরাগ, গুরুজনে ভক্তি, আচরণে বিনয়, পরনিন্দায় বিরক্তি, পরোপকারে প্রবৃত্তি, মিথ্যাচরণে অশ্রদ্ধা, সর্ব্বজনে সমভাব আছে, তিনিই সচ্চরিত্র। সচ্চরিত্রের প্রতি অনুরাগ ও অসচ্চরিত্রের প্রতি বিরাগ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। সাধুজন-প্রশংসনীয় কার্য্যকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম কহে। কর্ত্তব্যপালনেই চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয়। কর্ত্তব্যপালন করিতে হইলে, আত্মসংযমের প্রয়োজন, আত্মসংযম না থাকিলে লোক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে; সুতরাং চরিত্রবান্ হইতে হইলে আত্মসংযম অভ্যাস করা উচিত। সত্যে অনুরাগ, ন্যায়পরতা ও অধ্যবসায় থাকিলে আত্মসংযম অভ্যস্ত হয়। অতএব চরিত্রগঠন করিতে হইলে সত্যের প্রতি অনুরাগের প্রয়োজন। সত্যে অনুরাগ থাকিলে, মনে কপটতা থাকিতে পারে না, মনে কপটতা না থাকিলে দুষ্কার্য্যেও প্রবৃত্তি হয় না।

সচ্চরিত্রের মহত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লোকে সদ্‌গুণের সমাদর করে, কিন্তু সাধুচরিত্রের পূজা করিয়া থাকে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউন, তাহাতেই উন্নতিলাভ করিতে পারেন। সকলেই তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত সুখে সুখী হইতে বাসনা করেন, তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করা আবশ্যক। কারণ, চরিত্রবান্ ব্যক্তিই আত্মপ্রসাদ লাভে সমর্থ হন। তাঁহার চিত্তে প্রীতি, সুখ ও শান্তি সদা বিরাজমান থাকে।

ভগবতী দেবীর বিবিধ সদ্‌গুণের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এবং ঐ সকল সদ্‌গুণের সমষ্টিই তাঁহার চরিত্র। কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে এক একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। সেইজন্য আমরা 'চরিত্র মাহাত্ম্য' নামে এই অধ্যায়ের অবতারণা করিলাম।

ভগবতী দেবী দয়ার মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি ছিলেন। তাঁহার এই দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার এই

দুই প্রবৃত্তি সাধারণ মানবের ঐ দুই প্রবৃত্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার এই দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি বৈরাগ্যসম্ভূত নহে। সংসারে এরূপ নরনারীর অভাব নাই, যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল বিভবের অধীশ্বর বা অধীশ্বরী। কিন্তু শমনের শাসনদণ্ডের কঠোর আঘাতে একে একে তাঁহাদের সংসারে সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইয়াছে। অতুল বিভব সম্ভোগের কেহই নাই। এরূপ অবস্থায় অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল বিভব তাঁহাদের হৃদয়ের শান্তি স্থাপন করিতে অসমর্থ। তখন তাঁহারা পারত্রিক মঙ্গল সাধনের জন্য মুক্তহস্তে বিপুল অর্থদান করিয়া অন্যের দুঃখ মোচনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের এরূপ দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি প্রশংসার যোগ্য হইলেও উহা বৈরাগ্যসম্ভূত। কিন্তু ভগবতী দেবীর সংসার বন্ধন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার বৃহৎ পরিবার, অনেক আত্মীয় স্বজন। ইহা সত্ত্বেও তিনি বসুধাবাসীজনগণকে আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বব্যাপী বিশাল হৃদয়ে সকলকে স্থান দিয়াছিলেন ঃ—ইহাই তাঁহার দয়া গুণের বিশেষত্ব। তাঁহার দয়ারূপ মন্দাকিনীর স্বাদুধারা, একপ্রাণতা, সমদর্শিতা ও শ্রদ্ধারূপ ত্রিধারার সম্মিলনে সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাও তাঁহার দয়াগুণের আর এক বিশেষত্ব। বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্রই তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইত। অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার বিপন্মোচনের জন্য তিনি যত্নবতী হইতেন। তাঁহার এই দয়া প্রবৃত্তির মূলে সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। অপরের দুঃখকে স্বকীয় দুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া, একপ্রাণ হইয়া, তিনি তাঁহার দয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। তাঁহার দয়া কখনও স্বার্থের পূতিগন্ধে বা

পক্ষপাত দোষে অপবিত্র বা কলঙ্কিত হয় নাই। কিংবা দানে অহঙ্কার প্রকাশে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি পরের উপকারের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরের উপকার করিয়াই জীবৎ কাল পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আর এক মাহাত্ম্য বিলাসিতার সহিত পরার্থপরতার বিষম দ্বন্দ্ব। তিনি বিলাসিতারূপ ব্যাধিকে পরিবার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে দেন নাই। এবং বিলাসিতার স্থলে মিতাচারের প্রয়োগ দ্বারা পরার্থপরতা সাধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রের আর এক মাহাত্ম্য তিনি তাঁহার পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বালিকা বধূ বেশেই শ্বশুর গৃহে আগমন করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র সংসারেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দরিদ্র অবস্থা তিনি চিরজীবন স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উন্নতির সহিত ভাগ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠার সময়েও তাঁহার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি দীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীন ভাবেই ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আর এক মাহাত্ম্য—জীবনের দুর্দ্দিনে যাহা তাঁহার নিত্যসহচর ছিল, সুদিনেও তিনি তাহার নিত্য পূজা করিয়াছিলেন। চরকায় সূতা কাটিয়া সেই সূতা বিক্রয় দ্বারা তাঁহার শ্বশ্রূদেবী অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আমরণ ভগবতী দেবী সেই চরকার নিত্যপূজা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যখন একাদশ বৃহস্পতির অবস্থা, তখন পর্য্যন্তও রাত্রি দেড় ঘটিকার পর প্রায় দুই ঘণ্টা একাকিনী বসিয়া ভগবতী দেবী নিত্য চরকায় সূতা কাটিতেন। তাহাতে তিনি

কিছুমাত্র অপমান বোধ করিতেন না। হারিসন্ সাহেব যখন বীরসিংহের বাটীতে আগমন করেন,তখন ঐ চরকা দেখিয়া সাহেব শম্ভুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এটা কি ?" শম্ভু বাবু তাহার কোন সদুত্তর না দিয়া বিষয়ান্তরে সাহেবের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। পরিশেষে সাহেব প্রস্থান করিলে, শম্ভু বাবু ক্রোধপরবশ হইয়া সেই চরকা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ভগবতী দেবী তাঁহার এই ব্যবহারে এতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন যে তিনি একদিন অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে শম্ভু বাবু চরকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তিনি অন্নজল গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা মহাত্মা রামদুলাল সরকারের চরিত্রেও এইরূপ মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। রামদুলাল হাটখোলা দত্তবাটীর সরকার ছিলেন। পরিশেষে তাঁহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ মদনমোহন দত্ত তাঁহাকে লক্ষ টাকা প্রদান করেন। যখন রামদুলাল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তখনও তিনি দত্তগৃহে মাসিক বেতন দশ টাকা স্বয়ং আনিতে যাইতেন। এবং মদনমোহন দত্তের সম্মুখে যাইবার সময় পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

অহঙ্কার ভগবতী দেবীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। ধনমদে তাঁহাকে গর্ব্বিত করিতে পারে নাই। দয়া তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। অনুগতপ্রতিপালন ও আশ্রিতবাৎসল্য, তাঁহার স্বভাবকে মধুময় করিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্রের আর এক মাহাত্ম্য, তাঁহার প্রফুল্লচিত্ততা। ফলতঃ প্রফুল্লচিত্ততা সূর্য্যালোকস্বরূপ। এই আলোক দ্বারা চিত্তক্ষেত্র উদ্দীপ্ত হইলে, আমরা মানব জীবন যেরূপ সার্থকতার সহিত উপভোগ করিতে

পারি, এমন অন্য কিছুর সাহায্যে পারি না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির নিকটে জগতের সামান্য পদার্থও সুন্দর ও সুখকর। যিনি সতত প্রফুল্লচিত্ত থাকেন, তিনি যেমন উৎসাহের সহিত জীবনের কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারেন, সদা-বিরক্ত কর্কশস্বভাব ব্যক্তি তেমন পারেন না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি যেমন স্বয়ং সর্ব্বদা সুখী থাকেন, অন্যকেও সেইরূপ সতত সুখী করেন। অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেই সুখবোধ করে।

এই অমূল্য প্রফুল্লচিত্ততা লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট উপায়। পৃথিবীতে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারেন। প্রফুল্লচিত্ততা জীবনের পবিত্রতা ও ঈশ্বরে অটল বিশ্বাসের ফল। যিনি রিপু সকলকে বশীভূত করিয়া শান্তচিত্ত হইয়াছেন, যিনি পাপাচরণ না করিয়া শুদ্ধমনা হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করেন, যাঁহাকে কোনরূপ কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ বা ভয় করিতে হয় না, এবং যিনি ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, সেই সাধু-হৃদয়েই সর্ব্বদা প্রফুল্লতার হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

কবি মৃত্যুকে 'শয়ন-স্থন্দর' বলিয়াছেন! ফলতঃ দুর্জ্জয় জীবন-সংগ্রামে শ্রান্তমানব যখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, বেদনা-বিবশ হৃদয়ে ক্ষণিক বিশ্রামলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন মৃত্যুই তাহার নিকট মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়! কিন্তু সে তখন উপলব্ধি করিতে পারে না যে, ইহা বিশ্রাম নহে!—চিরনিদ্রা! আর যখন জীব মায়ামুক্ত হয়, তখন এই অনিত্য দেহ-পিঞ্জর আর তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না!—সে তখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উর্দ্ধ বিমানে উঠিতে চাহে! তখন সেই মায়া-মুক্ত জীব তারস্বরে বলে,—

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত।"

মৃত্যু তাহার নিকট বিশ্বের পরপারে যাইবার সেতু!

মৃত্যু !—এ নাম শ্রবণ করিলে, সহসা হৃদয়ে ভীষণ আতঙ্কেরই উদ্রেক হয়; কিন্তু মৃত্যু যতই আমাদের অপ্রিয় হউক না কেন, ইহারই জন্য আমরা জীবনে সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হই। অদূরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ রহিয়াছে বলিয়াই স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়া বা সুকোমল তৃণশয্যা আমাদিগের নিকট সুখদায়ক। অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীতে গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ কম্পমান সামান্য দীপশিখাও আমাদিগের নিকট স্নিগ্ধ বোধ হয়। মৃত্যু আছে বলিয়াই যশোগৌরবে বিমণ্ডিত হইবার আমাদিগের এতদূর আকাঙ্ক্ষা ! বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইবার এরূপ ঐকান্তিকী ইচ্ছা ! মৃত্যু আছে বলিয়াই অমরত্ব লাভের জন্য আমাদিগের এরূপ প্রয়াস ! বিসর্জ্জন আছে বলিয়াই আবাহনের প্রভাতী সঙ্গীত এরূপ শ্রুতিসুখকর ! মৃত্যুর সহিত জড়িত বলিয়াই আমাদিগের নিকট জীবন এত প্রিয় ! জীবিত থাকিবার জন্য আমাদিগের এত প্রয়াস !—এত বাঞ্ছা ! এত আয়োজন !

১২৭৭ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবস কাশীধাম হইতে সংবাদ আসিল ঠাকুরদাসের জীবন সঙ্কটাপন্ন। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রই বিদ্যাসাগর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পিতৃপদসেবার নিমিত্ত কাশীযাত্রা করিলেন। এদিকে দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র ভগবতী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। রীতিমত সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধাদির সুব্যবস্থায় ঠাকুরদাস শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। ১৫ই ফাল্গুন বিদ্যাসাগর, জননী ও সহোদরদিগকে পিতৃপরিচর্য্যার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবতী দেবী ফাল্গুন, চৈত্র দুই মাস কাশীবাস করেন।

ক্রমে চৈত্রসংক্রান্তি সমাগত হইল। কাশীধামে সে দিন মহোৎ-

সব। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির জনতায় পরিপূর্ণ। বিবিধ বাদ্য-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত! পূতহোমগন্ধে দশদিক আমোদিত! 'হর', 'হর', 'বম্', 'বম্' শব্দে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত! কাশীধামে সে দিন উৎসবের আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবতী দেবী প্রাতঃকালে শয্যা-ত্যাগ করিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সুসম্পন্ন করিলেন। তৎপরে দেব-মন্দিরাদি দর্শনাভিলাষে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ভক্তিসহকারে দেবদর্শন, মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ ও দানাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পরে স্বহস্তে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া সকলকে ভোজন করাইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। ভগবতী পুনরায় সন্ধ্যাকালীন আরত্রিক দর্শন মানসে বহির্গত হইলেন। দেবদর্শন ও প্রণামাদি করিয়া গৃহে পুনরায় প্রত্যাগত হইলেন। পরিশেষে রন্ধনাদি কার্য্য সমাপনান্তর সকলের পরিচর্য্যা করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলেন। ভোজনান্তেই শয়ন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং সকলের সহিত বিবিধ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে বিষম বিসূচিকা রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেন। দীনবন্ধু দ্রুতপদে চিকিৎসকের নিকট গমন করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সকলেই প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। ক্রমে আরও দুই একজন চিকিৎসক আসিলেন। নিশাশেষে চিকিৎসকেরা পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "জীবনের আর কোন আশা নাই!"

ক্রমে রজনী প্রভাতা হইল। পুনরায় কাশীধামের চতুর্দ্দিক বিবিধ

বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত ও স্পন্দিত হইতে লাগিল। পুনরায় হোম-গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। পুনরায় 'হর', 'হর', 'বম্', 'বম্' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইল!—এ সমস্ত কি কাশীধামের বিশ্বেশ্বর ও মহামায়ার পূজার আয়োজন? না,—সাধ্বী সতী ভগবতীর স্বর্গারোহণের আবাহন! সাধু পাঠকগণ! সাধ্বী পাঠিকাগণ! হৃদয় থাকে ত একবার উপলব্ধি করুন,—উপলব্ধি করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করুন। কারণ, সংসারে স্বর্গ, নরক বলিয়া কিছুই জানি না—এই মৃত্যুতেই স্বর্গ নরকের পরিচয়! পাপী, তাপী বলিয়া কিছুই জানি না, এই মৃত্যুতেই তাহার পরিচয়! সরল, কপটাচারী বলিয়া কিছুই জানি না, এই মৃত্যুতেই সে সকলের পরিচয়! সেইজন্য মৃত্যুই সাধুদিগের উপাস্য! তাঁহারা প্রেমভরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন! এই মৃত্যুই বিশুদ্ধ পবিত্র বহ্নি!—ইহাই মানবাত্মাকে বিশ্বের পরপারে লইয়া যাইবার সময় পরিশুদ্ধ করে!

ক্রমে মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! ভগবতী সকলকে ক্ষীণস্বরে সুমিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, পরিশেষে পতির পদধূলি চাহিলেন। শান্ত, দান্ত, ধৈর্য্যশীল ঠাকুরদাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে ছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহার ধৈর্য্যচুতি হইল। আর তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ক্রন্দন করিতে করিতে ঠাকুরদাস গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি সাধ্বী সতী! তোমাকে আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করিব! তুমি নিজ পুণ্যবলে অগ্রেই গমন করিলে। তোমারই জয় হইল! তুমি যে সদা সর্ব্বদা বলিতে,—'জপ তপ কর, কিন্তু মর্‌তে

জান্‌লে হয়'।—কিরূপ করিয়া মরিতে হয়, যথার্থই তাহা তুমিই জানিয়াছিলে! তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হউক!"

ক্রমে ভগবতী দেবীর সংজ্ঞালোপ হইল। পুত্রপ্রদত্ত জলবিন্দু ওষ্ঠ-প্রান্তে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নাভিদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সাধ্বী সতী যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন!—মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি! অপূর্ব্ব মাধুরী!—জীবাত্মা দেহ-পিঞ্জর হইতে ধীরে ধীরে পরমাত্মায় লীন হইতেছে!—এ মহাসঙ্গম! এ গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতে হয়! যেন স্বতই মনে হয়, মা আনন্দময়ি!—এ কি তোমার বিচিত্র লীলা! শুনিয়াছি সাধ্বী সতী পতিব্রতা রমণীর হৃদয়ে তুমি আনন্দময়ীরূপে সতত বিরাজ কর। মা! মরণেও তুমি আনন্দময়ীরূপে স্বপ্রকাশ!—একি তোমার আনন্দের লীলা খেলা!—মা! তোমার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিতাভস্ম।

শ্মশান!—তুমি মানবের শেষ সদ্গতি-স্থল!—তুমি মহাপবিত্র পুণ্য তীর্থক্ষেত্র!—তোমার এখানে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ক্ষুদ্র—সংসারের এই ভেদজ্ঞান নাই!—তোমার এখানে স্বাভাবিক, কৃত্রিম; নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক; পার্থিব, অপার্থিব;—এ সকল বৈষম্য নাই!—এমন সাম্যস্থান জগতে ত অন্বেষণ করিয়া পাই না!—সেইজন্য মনে হয়, শ্মশান!—তুমি মহাপবিত্র পুণ্যতীর্থক্ষেত্র! তোমার এখানে আসিলে, মনুষ্যজীবনের অসারতা উপলব্ধি হয়,—আত্মাভিমান সঙ্কুচিত হয়,—স্বার্থপরতা দূরে পলায়ন করে,—অশান্ত মানব ক্ষণেকের জন্য শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে!—সেইজন্য মনে হয়, শ্মশান!—তুমি মহাপবিত্র পুণ্য-তীর্থক্ষেত্র! তোমার এখানে আসিলে,—মনে ঘোরতর বৈরাগ্যের উদ্রেক হয়!—কুলের অহঙ্কার, শীলের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, ধর্ম্মের অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার,—সকল অহঙ্কারই চূর্ণীকৃত হয়!—সকল অহঙ্কারই তোমার বক্ষে পড়িয়া চিতাভস্মে পরিণত হয়!—সেইজন্য মনে হয়, শ্মশান!—তুমি মহাপবিত্র পুণ্য-তীর্থক্ষেত্র!

পুণ্যতীর্থ কাশীধামে, জাহ্নবীবক্ষে, মণিকর্ণিকায়, ঐ চিতা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে! ঐ চিতাগ্নিতে সতীর পবিত্র দেহ পুড়িতেছে!—সৌন্দর্য্য পুড়িতেছে!—বিশ্বপ্রেম পুড়িতেছে!—সরলতা, কোমলতা; পবিত্রতা, প্রফুল্লতা পুড়িতেছে!—ওজস্বিতা, তেজস্বিতা; মনস্বিতা, দীনতা; মহানুভবতা, পরার্থপরতা; সহিষ্ণুতা পুড়িতেছে!—মহত্ত্ব, মিতাচার; দয়া, পরোপকার; সৌজন্য, সদাচার; কর্ত্তব্যবুদ্ধি সমস্তই পুড়িতেছে!—বিদ্যাসাগরের জীবনের জ্যোতিঃ পুড়িতেছে!—এই সকলের সমষ্টি পুণ্যশীলা, দীনজননী ভগবতী দেবী পুড়িয়া ক্রমে চিতাভস্মে পরিণত হইতেছেন!—মানবজীবনের ইহাই পরিণাম!—জগতের ইহাই নিয়ম!

জগৎ!—অর্থাৎ যাহা যায়!—মানুষ জন্মে, আবার মরে!—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই জন্মে, আবার দুইদিন পরে মরে!—বৃক্ষ, গুল্ম, লতা সকলেই জন্মে ও মরে!—নির্ম্মলসলিলা, প্রাণরূপিনী স্রোতস্বিনী, নয়নানন্দকর, গাম্ভীর্য্যময় সুনীল পর্ব্বতরাজি, অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রী, সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত এবং উদ্ভিজ্জ ও জীব জগতের প্রসবিতা সবিতৃদেব, অনন্ত ব্যোমব্যাপী সুবিচিত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—সকলেরই আদি ও পরিণাম—ঐ জন্ম ও মৃত্যু; প্রকাশ ও বিনাশ; উৎপত্তি ও লয়! সকলেই আসে ও কিছুদিনের জন্য বিশ্বে নিজ নিজ লীলা প্রদর্শন করিয়া অনন্তে বিলীন হয়!

সমস্তই যায়!—কিছুই কি থাকে না? মানুষ মরে, কিন্তু মৃত্যুকেও উপহাস করে, এমন কি কিছু তাহার মধ্যে আছে?—মানুষের

কীৰ্ত্তিই একমাত্র অবিনশ্বর!—কীৰ্ত্তিই তাহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখে!—মানুষের এই কীর্ত্তিই স্মরণ করিয়া অনন্তকাল ব্যাপিয়া জগৎ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করে!

শোক কি?—মৰ্ম্মন্তুদ করুণ বিলাপই কি শোক? না!—শোক অর্থে মনে হয়,—ইহা স্মৃতির উপাসনা!—এই স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব!—অনন্তকাল ব্যাপিয়া মানুষ, মানুষের জন্য অনুরাগ প্রকাশ করিবে,—ইহাই প্রকৃত শোক!—সেইজন্য মনে হয়, শোক,—স্মৃতির উপাসনা! শোক,—অনন্ত সাধনা!

বঙ্গসন্তানগণ! পুণ্যশীলা ভগবতী দেবীর **চিতাভস্ম** গ্রহণ করুন!—অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই আদর্শ জননীর স্মৃতির উপাসনা করুন!—তাঁহার সাধনা করুন! বঙ্গজননীগণ!—সতীর **চিতাভস্ম** গ্রহণ করুন!—যাঁহারা পুণ্যশীলা, তাঁহারা পুণ্যের পূজা করুন! যাঁহারা আদর্শে জীবন গঠন করিতে যত্নশীলা, তাঁহারাও পুণ্যের আরাধনা করুন!—সকলে আদর্শজননী হউন!—ইহাই আপনাদের নিকট বঙ্গসন্তানগণের বিনীত প্রার্থনা!—আপনারাই বঙ্গের প্রতি গৃহের গৃহলক্ষ্মী,—আপনারাই বঙ্গের প্রতি পর্ণকুটীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—আপনাদের স্তন্যসুধাপানে বঙ্গসন্তান শশিকলার ন্যায় অনুদিন বৰ্দ্ধিত,—আপনাদের স্নেহ মমতায় বঙ্গসন্তান চিরদিন পরিপুষ্ট,—আপনাদের শিক্ষায় দীক্ষায় বঙ্গসন্তান শিক্ষিত ও দীক্ষিত,—আপনাদের আশীৰ্ব্বাদ তাহাদিগের একমাত্র সম্বল!—আপনারা সুমাতা হউন,—বঙ্গসন্তান, আপনাদেরই সুসন্তান বলিয়া

—জগতে ধন্য হউক! আপনারা তপস্যা ও সাধনার বলে ভগবতী দেবীর ন্যায় আদর্শজননী হউন! আপনাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রভাবে বঙ্গের গৃহে গৃহে বিদ্যাসাগর বঙ্গসন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করুন!

সমাপ্ত।

পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

বিদ্যাসাগর বাটী
কলিকাতা
২৮এ কার্ত্তিক ১৩১৯।

শুভাশিষঃ সন্তু—

আপনার প্রণীত 'ভগবতী দেবী' প্রাপ্ত হইয়াছি ও সযত্নে পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থখানি আমাদের—ভগবতী দেবীর বংশধরগণের নিকটে 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা'র ন্যায় সম্মানিত ও আদৃত হইবে। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দররূপে সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

স্বর্গীয়া পিতামহীদেবীর জীবনী মহোপদেশপূর্ণ। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য, ত্যাগস্বীকার, আতিথেয়তা, উদারহৃদয়তা ও গৃহিণীপণা স্ত্রীজন মাত্রেরই অনুকরণীয়। প্রাচীন কালের বর্ণজ্ঞানবিহীনা, প্রাচীনা হিন্দুরমণীর শিষ্টাচার, সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃত অথচ ধর্ম্মানুগত সামাজিক আচরণ দেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজ মহানুভবদিগেরও অন্তরে প্রীতি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, ইনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের গর্ভধারিণী। আপনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ

(স্বাঃ) শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

ভগবতী দেবীর মধ্যমা কন্যা ৺দিগম্বরী দেবীর পৌত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

সবিনয় নিবেদন—

আপনি এই দেবী-চরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার মানসে আমাকেই প্রথমে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি

আপনাকে সমভিব্যহারে করিয়া আমার খুল্লপিতামহী মন্দাকিনী দেবীর নিকটে লইয়া যাই। তিনি বিশদভাবে তাঁহার মাতৃচরিত্র আপনার সমীপে বর্ণনা করেন। সেই বর্ণিত বিষয় সমূহ আপনার সাধনার গুণে ও লিপিকৌশলে যেন জীবন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, পুস্তক পাঠে ইহাই আমার প্রতীতি জন্মিল। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে দেশের লুপ্তরত্নোদ্ধার করিয়া দশের কল্যাণসাধন করুন। পুস্তকে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই করি নাই। এ বিষয়ে আপনিই একমাত্র ধন্যবাদের পাত্র। আমরা চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম নিবেদন ইতি।

২৬এ কার্ত্তিক
১৩১৯ সাল।

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন :—

সবিনয় নিবেদন—

আপনার 'ভগবতী দেবী' উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছি। পূজাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূজনীয়া জননী ভগবতী দেবীর চরিত্রচিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন। জগতের ইতিহাসে যাঁহারা স্মরণীয়কীর্ত্তি মহাপুরুষ, তাঁহাদের জীবনে তাঁহাদিগের মহীয়সী জননীর পুণ্যপ্রভাব সম্যক্ লক্ষিত হয়। মহান্ পুরুষ বিদ্যাসাগর কিরূপ জননীর সন্তান ছিলেন, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশবাসীর জানা আবশ্যক। আপনার গ্রন্থের সাহায্যে তাহা অনেকাংশে জানা যাইবে। আপনার ভাষা প্রাঞ্জল ও অনাবিল এবং ঘটনাসংস্থান বেশ চিত্তাকর্ষক। আশা করি আপনার গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে ইতি।

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সংস্কৃত পরীক্ষক পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"আমি পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়দর্শন হালদার মহাশয়ের প্রণীত ভগবতী দেবীর জীবনচরিত পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী। ভগবতী দেবীর চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় তিনি স্বর্গচ্যুতা দেবী ছিলেন। স্ত্রীচরিত্রে যে সকল গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকের স্বভাব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তৎসমুদয় ভগবতী দেবীর চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিদ্যাসাগর জননীর হস্তে গঠিত হইয়াছিলেন। জননীর গুণগ্রাম তাঁহার স্বভাবে সংক্রান্ত হওয়াতে বিদ্যাসাগর জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন। এইরূপ অশেষ গুণবতী মহিলার চরিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া প্রিয়দর্শন বাবু সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রিয়দর্শন বাবুর সুন্দর পুস্তকের ভাষা সুন্দর, ভাব সুন্দর, চরিত্রাঙ্কন পরম সুন্দর।

আমার মতে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক বাঙ্গালা পাঠশালায় ও প্রত্যেক গৃহে থাকা উচিত। ভগবতী দেবীর উন্নত চরিত্রের দৃষ্টান্তে বঙ্গের মহিলাসমূহ নিজ নিজ চরিত্র সংগঠন করিতে পারেন, এইজন্য আমি বঙ্গজননীদিগকে ভগবতী দেবীর জীবনচরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রিয়বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি তিনি বিদ্যাসাগরজননীর চরিত্রাঙ্কন বলে অনুপ্রাণিত হইয়া রাণী ভবাণী, রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি বঙ্গের অন্যান্য দেবীর চরিত্রাঙ্কনপূর্ব্বক বঙ্গের প্রতি গৃহে কল্যাণ বিতরণ করুন ইতি।

শুভানুধ্যায়িনঃ

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

The Central Library of 10-1 Cornwallis Street, Calcutta, has done a service to the cause of Bengali literature by publishing the life of Bhagabati Devi, mother of the great Iswar Chandra Vidyasagar, written

by Babu Priyadursana Haldar. Bhagabati Devi's influence in the making of her son's character should be widely known to all our boys and girls, who receive any education at home or in school. The book is written in an elegant style and depicts the character of the mother and the son and of the society in which they lived in a masterly manner and is replete with reflections which are ennobling as well as instructive. I wish the author and the publishing house every success.

Calcutta,
22-3-1913.

(Sd) J. N. Ghosh M. A. B. L.
Retired District and Sessions Judge.

"Bhagabati Devi"—This is a nice publication containing an account of the life of the pure-hearted lady the late Bhagabati Devi, the mother of the great Iswar Chandra Vidyasagar, written by Babu Priya Darsana Haldar. Biographies of female celebraities are somewhat rare in this country. The homely incidents of her peaceful and ideal life seem to be at least equally ennobling and instructive in this book. The learned author has described in an elegant style the lady's career, and enpassant the beauty, peace and comforts of a joint Hindu family. Incidentally the writer has also touched upon some phases of the life of her renowned son Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. Apart from various other important considerations the mere fact that the great Vidyasagar had his being from this lady should make everyone curious to know

something of her. The get-up of the book is excellent and the reflections of the author here and there are very instructive. The book may very profitably be introduced into the higher classes of our schools as a text book. Indeed it is a book, a copy of which should be in the hand of every educated Bengali lady.

The Amrita Bazar Patrika, November 7, 1912.

A bright little book in Bengali on the life of "Bhagabati Devi" the mother of the immortal Vidyasagar from the pen of Babu Priya Dursana Haldar has just been published. A careful study of this admirably written book will convince the reader that Vidyasagar would not have been what he was, but for the chastening, invigorating and wholesome influences of his great mother. To write the biography of a Hindu lady, in the unromantic and uneventful surroundings of a middle class household, having none of the glamour attaching to the position or the splendid achievements of an Ahalyabai or a Rani Bhabani, is a difficult task indeed, but our author, even from the scanty materials at his disposal, has drawn a character which is not surpassed in interest by the narrative of any eventful life, and which in sweetness and moral beauty and grandeur, challanges profound admiration and respect. Bhagabati Devi had a heart that beat in unison with human suffering and overflowed with the milk of human kindness. It does the heart good to estimate the nobility of her soul and breadth of her sympathies from the interesting account supplied by the author,

of the way in which she went on with her mission of relieving the misery and suffering that she found around her. As we read the book, the conclusion becomes irresistible that the true greatness of the mother found a natural and inevitable complement in the greatness of her son. The skilful way in which the author has recorded her life and delineated her character cannot be too highly praised. His diction is chaste, vigorous and eloquent, which lends itself admirably to the treatment of the subject. The evident success that has attended the labours of the author leads us to hope that he will bring out similar excellent biographies of other great and good mothers of the great men of our country. We shall be glad to see this book in the hands of our girls and find a cordial welcome in every Hindu household. The high ideals represented by the life of Bhagabati Devi can not fail to have an elevating effect upon the mind of the reader. We hope the book will find due recognition at the hands of our educational institutions.

The Indian Mirror, November 13, 1912.

This is a biographical sketch of Bhagabati Devi, the great mother of the great Vidyasagar. The sketch accounts for some of the finest traits in the character of the illustrious Pandit, for it was from his mother that he inherited them. Bhagabati Devi was a remarkable woman of the time in which she lived. She combined in her person the Lady Bountiful and Cornelia

of Roman fame, and her life is an impressive object lesson to all Hindu ladies who aspire to be model daughters-in-law, model mothers and model matrons. It was a happy idea of the author to write an account of Bhagabati Devi, and he deserves to be congratulated on the manner in which he has represented it.

The Hindu Patriot, December 9, 1912.

Babu Priya Dursana Halder has brought out a life sketch in Bengali of Bhagabati Devi mother of our Vidyasagar. Mother's influence in the making of son's greatness or otherwise is a most interesting phenomenon in human lives. Bhagabati Devi's share in the formation of the character of her son, a towering personality in Bengal, cannot fail to be a source of interest to the readers of Bengali literature. The author should be congratulated on the choice of his subject and the success which has attended his work. The book under notice is calculated to prove a valuable addition to Bengali biographical literature. The book can be profitably used as a text book in higher classes of our schools.

The Bengali, December 12, 1912.

গ্রন্থকার এই পুস্তকে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর জীবনী ও কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুত্রের ভাবী উন্নতি বা অবনতি বহুল পরিমাণে যে জননীর কার্য্যকলাপের উপর নির্ভর করে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কি পাশ্চাত্য দেশে, কি প্রাচ্যদেশে সর্ব্বত্রই ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, সার্ উইলিয়ম

জোন্স, আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক এডাম প্রভৃতি জননীর শিক্ষা অনুসারেই বড়লোক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লোক হইয়াছিলেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তরও তাঁহার জননীর চরিত্র ও কার্য্যকলাপ। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। এরূপ পুস্তক প্রত্যেক রমণী ও প্রত্যেক পুরুষেরই পাঠ করা উচিত। এ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।—হিতবাদী, ১৩ ডিসেম্বর ১৯১২।

আমরা পুস্তক খানি আদোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবী সন্তানপালনে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক হিন্দুরমণীর শিক্ষনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। পুস্তকের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

এই গ্রন্থখানি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী স্বর্গীয়া ভগবতী দেবীর জীবন-কাহিনী। যিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ ও লালন পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিতপাঠে বাঙ্গালীর পুণ্যসঞ্চয় হইবে। ভগবতী দেবীর পিতা মহাত্মা রামকান্ত তর্কবাগীশ শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে ভগবতী দেবীর দেবীচরিত্র কিরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সংবাদ-পত্রের স্বল্পস্থানে এরূপ সুন্দর চরিতগ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা যায় না। তবে সেকালের হিন্দুরমণীরা কিরূপ পুণ্যশীলা, মিতাচারিণী, বিনয়-বিনম্রা, তেজস্বিনী ও সেবাব্রতা ছিলেন, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে ভগবতী দেবীর ন্যায় পুণ্যচরিত্রা হিন্দুরমণীর সংখ্যা কালমাহাত্ম্যে লোপ পাইতেছে। এই গ্রন্থে সেকালের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের অনেক তথ্যই সন্নিবিষ্ট আছে। পুস্তকের ভাষা, ভাব, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। এইখানি অতি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ। হিন্দুর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের আদর হওয়া আবশ্যক। বালিকাবিদ্যালয়ে ইহা অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য।—বসুমতী, ১লা চৈত্র ১৩১৯।